১.৪ গ্রন্থপঞ্জী

(১) Andrew Haywood : Macmillan Press—Politics (1997)

(২) Andrew Haywood : Macmillan Press—Political Ideologics—An Introduction. (1982, 1998)

(৩) Ralph Miliband : Oxford University Press—Marxism And Politics. (1977)

(৪) S. P. Verma : Modern Political Theory. Vikas (1979)

(৫) পরিমল চন্দ্র ঘোষ : রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলসূত্র, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা (১৯৮০)

(৬) পরিমল চন্দ্র ঘোষ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান : তত্ত্ব ও পদ্ধতি, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা (১৯৮৩)

(৭) শোভনলাল দত্তগুপ্ত : মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা (১৯৮৪)

(৮) সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা (১৯৯৭)

একক—২ ❐ রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

২.২.১ চুক্তিবাদী তত্ত্ব

২.২.২ মূল বক্তব্য

(ক) টমাস হবস

(খ) জন লক

(গ) জাঁ জাঁ রুশো

(ঘ) জন রলস

২.২.৩ সমালোচনা

২.২.৪ মূল্যায়ন

২.৩ বিবর্তনবাদী তত্ত্ব

২.৩.১ বিবর্তনবাদী তত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন ধারা

২.৩.২ বিভিন্ন উপাদান

(ক) রক্তের সম্পর্ক

(খ) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

(গ) ধর্ম

(ঘ) ক্ষমতা

(ঙ) রাজনৈতিক চেতনা

২.৩.৩ উপসংহার

২.৪ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

২.৪.১ জৈব মতবাদ

২.৪.২ জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা

২.৪.৩ মূলবক্তব্য

২.৪.৪ সমালোচনা

২.৪.৫ মূল্যায়ন

২.৫ ভাববাদ
২.৫.১ মূল বক্তব্য
২.৫.২ সমালোচনা
২.৫.৩ ভাববাদের সাম্প্রতিক রূপ
২.৫.৪ মূল্যায়ন
২.৬ অনুশীলনী
২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির মাধ্যমে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারি—

- রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্ব।
- চুক্তিবাদের প্রবক্তা হিসেবে টমাস হবস, জন লক এবং রুশোর বক্তব্য।
- চুক্তিবাদের সাম্প্রতিক রূপ।
- রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্ব।
- রাষ্ট্রের উদ্ভবে যে সমস্ত উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তার বিবরণ।
- রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈববাদী মতবাদ ও এই মতবাদের সীমাবদ্ধতা।
- রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে আদর্শবাদী/ভাববাদী তত্ত্ব।
- আদর্শবাদী/ভাববাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা।
- আদর্শবাদের সাম্প্রতিক রূপ।

২.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান এককে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদগুলি রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদকে বাছাই করে আলোচনা করা হবে। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে লক্ষ্য করা গেলেও ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করে। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে ঔৎসুক্যই সামাজিক চুক্তি মতবাদীদের মূল লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা রাষ্ট্রের উদ্ভবে চুক্তিবাদী তত্ত্ব দিয়ে ঐশ্বরিক মতবাদকে যেমন খণ্ডন করতে চেয়েছেন, অপরদিকে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের বিষয়ে এক নতুন মাত্রা দিতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্বটি শুধুমাত্র রাজনীতিবিজ্ঞানেই নয়, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্বেও আলোচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বগুলির মধ্যে জৈব ও আদর্শবাদী তত্ত্বটি আলোচিত হয়েছে। আদর্শবাদী তত্ত্বটি আবার ভাববাদী তত্ত্ব নামেও পরিচিত। উভয় তত্ত্বই রাজনীতিচর্চার বিভিন্ন পর্বে আলোচিত হলেও অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে এই দু'টি তত্ত্ব বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

২.২ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

রাষ্ট্রের সৃষ্টি কিভাবে হ'ল—এই প্রশ্নটি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশের রাজনীতিবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থে (যেমন, মহাভারতের শান্তি পর্বে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, কামন্দকীয় নীতিসারে) এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। একইভাবে প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকগণও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। মধ্যযুগের দার্শনিকগণ যেমন, সেন্ট অগাস্টিন (St. Augustine ?—604), সেন্ট টমাস একুইনাস (St. Thomas Aquinas 1225-1274)-এর রচনাতে এই প্রশ্নের উত্তর থেমে থাকেনি। আধুনিক যুগের রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ যেমন, টমাস হবস (Thomas Hobbes 1588-1679), জন লক (John Locke 1632-1704), জাঁ জা রুশো (Jean Jacques Roussean 1712-1778), হেগেল (Hegel 1770-1831) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন যুগে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হওয়ার কারণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাই নয় ; এই প্রশ্নটির উত্তরের মাধ্যমে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে, রাষ্ট্রকে মেনে চলা বাধ্যতামূলক কিনা, রাষ্ট্রের প্রকৃতি বা স্বরূপই বা কি?—এই প্রশ্নগুলির উত্তরও পাওয়া যাবে। যেমন, 'রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি'— এই তত্ত্ব প্রচার করে একসময় জনসাধারণের কাছ থেকে চরম আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা হয়েছিল। আবার রাষ্ট্র যদি জনগণের চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট হয় তাহলে জনগণই প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এই মত মেনে নিতে হয়। রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে যে সমস্ত তত্ত্বগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঐশ্বরিক মতবাদ, চুক্তিবাদী তত্ত্ব, বলপ্রয়োগ তত্ত্ব, বিবর্তনবাদী তত্ত্ব যা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নামেও পরিচিত। আমরা এখানে চুক্তিবাদী তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বটি আলোচনা করব।

২.২.১ চুক্তিবাদী তত্ত্ব

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্বের আদি নিদর্শন পাওয়া যায় ভারতে মহাভারতে শান্তিপর্বে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, বৌদ্ধদর্শনে, প্রাচীন গ্রীসে ও খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে সফিস্ট (Sophist) বা তাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই সমস্ত বক্তব্যে রাষ্ট্রকে চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট এক স্বেচ্ছামূলক সংগঠন বলে প্রচার করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছামূলক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্রকে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার বিরোধী ও ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথে বাধা হিসেবে প্রতিপন্ন করা। তবে সুনির্দিষ্ট আকারে ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চুক্তিবাদী তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে টমাস হবস, জন লক ও জাঁ জা রুশোর রচনায়। উক্ত তাত্ত্বিকদের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রকে 'ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট' এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তে রাষ্ট্র জনগণের চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট এই মত প্রচার করে ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা। সাম্প্রতিককালে জন রলস্ (John Rawls, 1971)-এর রচনায় সামাজিক চুক্তি মতবাদটি আলোচিত হয়েছে ব্যক্তিকে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে।

২.২.২ মূল বক্তব্য

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ককে চুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষ্য করি হবস, লক ও রুশোর রচনায়, যদিও চুক্তির পূর্বেকার অবস্থা, চুক্তির ধরন, চুক্তির শর্ত প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিকগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। এই তিন দার্শনিকই চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট রাষ্ট্রের পূর্ববর্তী অবস্থাকে প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত প্রকৃতির রাজ্যের অবস্থা (State of Nature) বলে উল্লেখ করেন।

(ক) টমাস হবস—

টমাস হবস [Thomas Hobbes (1651)]-এর মতে রাষ্ট্রপূর্ব প্রকৃতির রাজ্য ছিল প্রাক্-সামাজিক ও প্রাক্-রাজনৈতিক। হবস মানবচরিত্রের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর। স্বার্থপরতা, প্রতিযোগিতা প্রভৃতির ফলে সমাজে মানুষের জীবন ছিল জঘন্য, পাশবিক, ঘৃণ্য ও স্বল্পায়ু। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ চুক্তির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা ও অধিকার হস্তান্তর করে সার্বভৌমের হাতে। এবং এর ফলে মানুষ সার্বভৌমকে মানতে বাধ্য ; নতুবা পুনরায় প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী, যা জঘন্য ও পাশবিক। এভাবে হবস চুক্তির মাধ্যমে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌমের সৃষ্টি করলেও সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস যে মানুষ সে সম্পর্কে হবস-এর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

(খ) জন লক—

জন লক [John Locke (1690)] যে সময় রাষ্ট্রতত্ত্ব রচনা করেন তখন ইংলণ্ডে হবসের সময়ের তুলনায় পুঁজিপতিশ্রেণী অনেক বেশী সংঘবদ্ধ। সামন্তশক্তির তুলনায় রাজাই পুঁজিবিকাশের পথে অন্তরায়। এমতাবস্থায় প্রয়োজন রাজার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা এবং ব্যক্তির অধিকারকে বৈধতা দেওয়া। জন লকের চুক্তিবাদী তত্ত্বে এই ঐতিহাসিক দায় অত্যন্ত স্পষ্ট। জন লকের মানুষ সহযোগী এবং এ কারণে সামাজিক। তিনি মনে করেন মানুষ কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকার (natural rights) যেমন—জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার নিয়েই জন্মায়। প্রকৃতির রাজত্বেও মানুষ এই অধিকারগুলি ভোগ করত। প্রকৃতি-রাজ্যের এই সামাজিক কিন্তু প্রাক্-রাজনৈতিক যুগে মানুষ প্রত্যেকেই যুক্তির অনুশাসন মেনে চলত। প্রকৃতি-রাজ্যে স্বাধীনতা, সম্পত্তির নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিরাজ করলেও তিনটি কারণে তা অসম্পূর্ণ ছিল। প্রথমত, যে স্বাভাবিক আইন দ্বারা প্রকৃতি-রাজ্যের মানুষ পরিচালিত হ'ত সেই আইন সম্পর্কে মানুষের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। এ কারণে অপরের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থাকত। দ্বিতীয়ত, এই আইনকে ব্যাখ্যা করার মত কোনও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ছিল না। তৃতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্যের স্বাভাবিক আইন বলবৎ করার কোনও সংস্থা ছিল না। এ কারণে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চুক্তির মাধ্যমে এক রাজনৈতিক সমাজের উদ্ভব ঘটা। এই রাজনৈতিক সমাজ যাতে ভেঙ্গে না পড়ে বা অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য আরেকটি (দ্বিতীয়) চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌম বা সরকারের প্রতিষ্ঠা করে। সার্বভৌম জনগণের সম্পত্তি, স্বাধীনতা ও জীবনের সুরক্ষা করবে। জিম্মাদার হিসেবে সরকারের এই দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হ'ল সরকারের কাছে গচ্ছিত ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটলে সার্বভৌমকে অপসারণ করা যাবে। জন লক প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনগণের হাতেই রেখে দেন ; সার্বভৌম শুধুমাত্র এই গচ্ছিত ক্ষমতার জিম্মাদার বা তত্ত্বাবধায়ক। এভাবে জন লক সীমিত সার্বভৌমিকতার তত্ত্বই প্রচার করেন।

(গ) জাঁ জা রুশো—

জাঁ জা রুশো (Jean Jack Roussean) ইংলণ্ডে টমাস হবস বা জন লকের মতই ফরাসী দার্শনিক রূশোও রাষ্ট্রের উদ্ভবকে সামাজিক চুক্তিরই ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করেন। ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Discourses on the Origin of Inequality এবং ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Social Contract গ্রন্থে প্রকৃতি রাজ্যের অবস্থা ও সমাজ/রাষ্ট্রসৃষ্টির কারণ সম্পর্কে বক্তব্যের ভিন্নতা থাকলেও রাষ্ট্র যে সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভুত এই মূল বক্তব্যটি থেকে তিনি সরে আসেননি। টমাস হবসের মত তিনি প্রকৃতি-রাজ্যকে হিংস্র, পাশবিক, ঘৃণ্য ও স্বল্পায়ু হিসেবে চিহ্নিত করেননি। আবার জন লকের মত প্রকৃতি-রাজ্যের মানুষ যুক্তিবোধসম্পন্ন বলেও অভিহিত করেননি। রুশোর মতে প্রকৃতি-রাজ্যের মানুষ বৌদ্ধিক ক্ষমতাশূন্য মানুষ ; ব্যক্তিস্বার্থ ও করুণা—এই দুই ভাবাবেগই মানুষকে পরিচালিত করত এবং মানুষের জীবন ছিল সরল, সমভাবাপন্ন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তৃপ্ত, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবে সামাজিক বৈষম্য দেখা দেয়—পরিসমাপ্তি ঘটে প্রকৃতি-রাজ্যের স্বর্গসুখ। সৃষ্টি হয় পুরসমাজের (civil society) যারা নানা প্রতিষ্ঠান মানুষের সহজাত শুভবোধকে বিনষ্ট করে তাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করল। সভ্যতা তথা পুরসমাজই মানুষের স্বাধীনতা তথা মুক্তির প্রতিবন্ধক। এই কারণে তিনি মন্তব্য করেন—মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন কিন্তু সে হয়ে পড়ে সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ। Discourses on the Origin of Inequality (1755) গ্রন্থে রুশো সভ্যতা তথা পুরসমাজের কঠোর সমালোচক হ'লেও social contract (1762) গ্রন্থে তিনি সামাজিক চুক্তিকে প্রকৃতির রাজ্য থেকে পুরসমাজের রূপান্তরের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে দেখেন এবং পুরসমাজের বৈধতাবিধানে সচেষ্ট হন। রুশোর মতে, প্রকৃতিরাজ্যের মানুষ পরস্পর সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে কোন ব্যক্তিবিশেষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করে সামগ্রিকভাবে সমাজের উপরেই এই ক্ষমতা অর্পণ করে কারণ এই সমাজ 'সাধারণের ইচ্ছা'র (General Will) প্রতিনিধিত্ব করে। 'সাধারণের ইচ্ছা' সকল ব্যক্তিসমূহের ইচ্ছার সমষ্টিমাত্র নয়—সকলের মঙ্গলকামী ইচ্ছার সমষ্টি। একজন মানুষ পুরসমাজ গঠনের পূর্বে যে সমস্ত অধিকার ভোগ করত তা হস্তান্তর বা ত্যাগ না করে সামগ্রিকভাবে সমাজের হাতেই অর্পণ করায় ব্যক্তি আগের মতই স্বাধীন, অবিচ্ছিন্ন। এভাবে রুশো রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার সমন্বয়সাধনে সচেষ্ট হন।

(ঘ) জন রলস—

সাম্প্রতিককালে—জন রলস [John Rawls (1921)] A Theory of Justice (1971)—গ্রন্থে ন্যায়তন্ত্র রচনার ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি মতবাদটির উপর আলোকপাত করেন। রলস-এর মতে চুক্তির ধারণা অন্তত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, ব্যক্তির কাছে সমাজশৃঙ্খলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির রাজ্য থেকে সরে আসার অন্যতম কারণই হ'ল সমাজশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি যা ব্যক্তির ন্যায় বোধেরই প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, চুক্তির ধারণা এমন এক কল্প পরিস্থিতি (Imaginary Situation)-এর কথা বলে যেখানে ব্যক্তি কোন্ ধরনের সমাজে বাস করবে বা কোন্‌টি কাম্য ব্যবস্থা তা ব্যক্তিই বাছাই করবে। অর্থাৎ ব্যক্তি এখানে যুক্তিবোধসম্পন্ন যার অধিকার এবং সামর্থ্য রয়েছে কোন্‌টি তার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং সঠিক, কোন্‌টি কম অসুবিধাজনক তা বাছাই করার। ন্যায়তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে জন রলস তাই চুক্তিবাদীদের মত মানুষকে এক কল্প অবস্থায় (Imaginary stage) দাঁড় করায় যা ব্যক্তির মৌলিক অবস্থান অর্থাৎ

যেখান থেকেই তার যাত্রাপথ শুরু। এর সত্যতা বা ঐতিহাসিকতা যাই থাকুক না কেন তা যুক্তিবিচারে সঠিক। জন রলস চুক্তিবাদীদের মত ব্যক্তির এই মৌলিক অবস্থানকে অজ্ঞতার পর্দা (Vail of Ignorance)-র আড়ালে অবস্থান বলে মনে করেন। এখানে ব্যক্তি জানেন তার সঠিক সমাজে কোন্‌টি, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানই বা কি? তার নিজস্ব ক্ষমতা, বুদ্ধি সম্পর্কে সে অজ্ঞ। এমতাবস্থায় ব্যক্তিকে কতকগুলি সাধারণনীতি অনুসরণ করেই সঠিক সমাজ বাছাই করতে হবে কারণ যদি এই বাছাইকরণ সঠিক না হয় তাহলে তাকে এবং বংশানুক্রমিকভাবে তার পরিবারবর্গকে এর ফলভোগ করতে হবে। রলস-এর মতে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হ'ল এমন একটা সমাজ বাছাই করা যেখানে বৈষম্য সবচেয়ে কম। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তিকে যদি বলা হয় একটি কেক কাটতে এবং সবশেষে তার ভাগটুকু নিতে তাহলে সেই ব্যক্তি চেষ্টা করবে কেকের সব টুকরোগুলি যেন সমান হয়।

ব্যক্তির তার মৌলিক অবস্থায় (প্রথম বা কল্প সমাজব্যবস্থায়) কিবাবে তার পছন্দ জানায় সে সম্পর্কে রলস বিস্তারিত আলোচনা করেন। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে দেখা যাক রলস কি ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছেন।

জন রলস যে সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন তা মূলত দু'টি ভিন্ন সূত্রের দ্বারা পরিচালিত। এক, সবার জন্য যে ব্যাপক স্বাধীনতার কথা বলা হয় সেই স্বাধীনতার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি সমান অর্থাৎ যা ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য তা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিত এবং দেখা উচিত যাতে কোনও ব্যক্তির অধিকার অপর ব্যক্তির অনুরূপ অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, অর্থাৎ যাতে অপরের অধিকারের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। জন রলস-এর দ্বিতীয় সূত্রটি হ'ল অ-সাম্যের নীতি। জন রলস সমাজে সম-অধিকারের কথা বললেও সমাজে বৈষম্যকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দু'টি ভিন্ন নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। প্রথমত, সমাজে অসাম্য এমনভাবে বিন্যস্ত হবে যাতে সমাজের সর্বাপেক্ষা কম সুবিধাভোগী সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হয়। দ্বিতীয়ত, এই অসাম্য একমাত্র কোন পদ বা অবস্থানের সঙ্গে জড়িত থাকবে এবং উক্তপদ বা অবস্থান প্রত্যেকের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও সুযোগের সমতা থাকবে। এই দু'টি সূত্রের মধ্যে, রলস-এর মতে, প্রথম সূত্রটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

২.২.৩ সমালোচনা

সামাজিক চুক্তি মতবাদটি বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন দিক থেকে রাজনীতিবিজ্ঞানীদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। প্রথমত, এই মতবাদের ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে পণ্ডিতগণ প্রশ্ন তোলেন। বস্তুত, চুক্তিবাদী তাত্ত্বিকগণ প্রকৃতি-রাজ্যের ধারণা, চুক্তিমাধ্যমে রাষ্ট্রসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়গুলি অনুকল্প (Hypothesis) হিসেবে নিয়েছেন। চুক্তির বিচারে তা গৃহীত হ'লেও ইতিহাসগতভাবে তা অবাস্তব। এর কোন নজির ইতিহাসে নেই।

দ্বিতীয়ত, চুক্তিবাদীগণ ব্যক্তির যে প্রকৃতি চিত্রিত করেছেন তা একপেশে। টমাস হবস-এর ব্যক্তি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, রুশোর ব্যক্তি ঠিক এর বিপরীত। অপরদিকে জন লক ব্যক্তিকে চুক্তির দ্বারা শাসিত বলে উল্লেখ করেন। ব্যক্তিকে এভাবে নিছক একটি ছকে বেঁধে বিশ্লেষণ করা অনুচিত।

তৃতীয়ত, টমাস হবস বা রুশো রাষ্ট্র তথা সার্বভৌম সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তির সম্মতি (consent)-এর কথা বললেও চুক্তি সম্পাদনের পর ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে সার্বভৌমের নিয়ন্ত্রণাধীন। এভাবে এই দুই তাত্ত্বিক চরম সার্বভৌম

(ব্যক্তি বা গোষ্ঠী) বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে স্বীকার করেছেন। জন লক দ্বিতীয়ত চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌমকে নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও লকের উহ্য সম্মতির (tacit consent) ধারণা বস্তুত ব্যক্তিকে সার্বভৌমের নিকট নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশে বাধ্য করে।

চতুর্থত, চুক্তিবাদীদের মতে, প্রাক্-রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি-রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সমাজ/সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। কিন্তু চুক্তির ধারণা একটি আইনগত ধারণা যাকে বলবৎ করার জন্য একটি আইনগত কর্তৃত্বের প্রয়োজন। প্রকৃতি-রাজ্যের মানুষের পক্ষে চুক্তির এই ধারণা লাভ যেমন সম্ভবপর নয়, কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের অভাবে তাকে বলবৎ করাও অসম্ভব।

পঞ্চমত, চুক্তিবাদী তাত্ত্বিকগণ, বিশেষতঃ জন লক, প্রকৃতির রাজ্যে যে অধিকারের কথা বলেছেন সেই অধিকার কেবল সুনির্দিষ্ট কর্তৃত্বের অভাবে অর্থহীন। তাছাড়া রাষ্ট্র শুধুমাত্র অধিকারের রক্ষকই নয় ; অধিকারের স্রষ্টাও।

ষষ্ঠত, প্রকৃতি-রাজ্যের বর্ণনা, চুক্তির প্রকৃতি ও পুরসমাজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রুশোর বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। Discourses on the Origin of Inequality (1755) গ্রন্থের বিদ্রোহী রুশো Social Contract (1762) গ্রন্থে রাষ্ট্র কর্তৃত্বের প্রথম সমর্থক।

২.২.২ মূল্যায়ন

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্বের উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই তত্ত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, চুক্তিবাদীদের কাছে মূল উদ্দেশ্য হ'ল রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের কারণ অন্বেষণ। এই কারণ অন্বেষণে এই তাত্ত্বিকগণ সঠিকভাবেই ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন—মধ্যযুগীয় ভাবনায় ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন ব্যক্তিকে। রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বেকার অবস্থার বর্ণনা তাই অনুকল্প হিসেবে গৃহীত হয়েছে—ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে নয়।

দ্বিতীয়ত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে পুঁজির যে বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তার প্রথম পর্বে প্রয়োজন ছিল সামন্ত, অভিজাত ও ধর্মীয় প্রাধান্যের নিয়ন্ত্রণ থেকে পুঁজিকে মুক্ত ও বিকশিত করার এবং এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তির। টমাস হবস-এর ব্যক্তি তাই পুঁজির বিকাশসাধনকারী স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক এবং সার্বভৌম ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। পরবর্তী পর্বে পুঁজিপতিরা যখন সংঘবদ্ধ ও বিকশিত তখন রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং ইতিহাসের এই পর্বে প্রয়োজন রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ। জন লকের রচনায় এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালিত হয়েছে। রুশোর সময় পুঁজিবাদের সঙ্কটের সময়। পুঁজিবাদী সমাজের এই নগ্নরূপ রুশো তুলে ধরেন তাঁর Discourses on the Origin of Inequality গ্রন্থে। সম্পত্তির উদ্ভব যে সামাজিক বৈষম্যের অন্যতম কারণ ; শিল্পীর সভ্যতা যে বক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে রুশোর এই ধারণাগুলি পরবর্তীকালে কার্ল মার্কসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সভ্যতা তথা পুরসমাজই যে সমাজবৈষম্যের প্রতীক—রুশোর এই তত্ত্ব শুধু ফরাসী বিপ্লবেই নয়—পরবর্তী পর্বের বিপ্লবকেও অনুপ্রাণিত করে।

তৃতীয়ত, ম্যাকফারসন (C. B. Macpherson)-এর মত টমাস হবস ও জন লকের রচনায় তদানীন্তন বস্তুবাদী মানুষ ও বাজারধর্মী সমাজের চিত্রই পরিস্ফুট হয়েছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডের সমাজ মূলত বাজারধর্মী অর্থাৎ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির/সংস্থার সম্পর্ক বাজারী (market relation) সম্পর্ক —

দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। ব্যক্তিও প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থসচেতন—বস্তুকেন্দ্রিক, দখলদারী, মুনাফালোভী। ম্যাকফরসনের মূল্যায়ন অনুযায়ী ব্যক্তি অধিকার ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রশ্নে হবস-এর দু'টি ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি হ'ল প্রবাহমান গতির জন্য চাহিদার/প্রয়োজনের সমতা এবং দ্বিতীয়টি হ'ল সমান নিরাপত্তাহীনতা। টমাস হবস-এর ন্যায় জন লকের ব্যক্তি ও নিজের শ্রমের ও শ্রমসৃষ্ঠ সম্পত্তির মালিক, নিজস্বার্থ সিদ্ধির তাগিদেই অপরের সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ এবং অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে নিজে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। সমাজ ও রাষ্ট্র হ'ল ব্যক্তির এই অধিকার ও সম্পত্তিসংক্রান্ত পারস্পরিক সম্পর্কের এক চুক্তিগত ব্যবস্থাপনা। জন লক অবশ্য সব সামাজিক সম্পর্ককেই বাজারী সম্পর্ক এবং সব নৈতিকতাকেই বাজারী নৈতিকতা (market morality) বলে মেনে নেননি। টমাস হবস বাজারধর্মী সমাজ ও মুনাফাকেন্দ্রিক মানুষের প্রকৃতিচিত্রণ করলেও বাজার তথা পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব তথা সঙ্কট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। টমাস হবস-এর জ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতাকে জন লক কাটিয়ে ওঠেন। রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে পুঁজিপতিদের বোঝাপড়ার এক ব্যবস্থাপনাও লকের দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

২.৩ বিবর্তনবাদী তত্ত্ব

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বহুলপ্রচলিত তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হ'ল বিবর্তনবাদী তত্ত্ব। এই তত্ত্বটি আবার ঐতিহাসিক তত্ত্ব নামেও পরিচিত। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হ'ল—ঈশ্বরের ইচ্ছায় বা জনগণের চুক্তির মাধ্যমে হঠাৎ একদিন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি। রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে দীর্ঘদিন ধরে, ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই ধরনের তত্ত্ব রচনায় প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের গবেষণা, বিশেষত, গ্যালিলিওর গতিতত্ত্ব, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, ইতিহাসের দর্শন রাজনীতিবিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করেছে। এই তত্ত্বটি ঐতিহাসিক ভাববাদীদের রচনায়, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্বে, বিবর্তনবাদী তত্ত্বে, নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় বিধৃত হয়েছে।

২.৩.১ বিবর্তনবাদী তত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন ধারা

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্বের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসের (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-চতুর্থ শতকে) দার্শনিকদের রচনায়। অরিস্টটল Politics গ্রন্থে রাষ্ট্রকে পরিবারেরই সম্প্রসারিত রূপ বলে উল্লেখ করেন। আরিস্টটলের দর্শনের উদ্দেশ্য হ'ল সুন্দর জীবন, যা সম্ভবপর হয় পরিবারের মাধ্যমে। ব্যক্তির দু'টি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি/সম্পর্ক যথা জৈবিক এবং অর্থনৈতিক (স্থানান্তরে তিনটি—অপত্যস্নেহ/সম্পর্ক) এর উপর ভিত্তি করে পরিবার যেহেতু গড়ে ওঠে সেহেতু পরিবার ব্যক্তিজীবনের স্বাভাবিক সংগঠন। পরিবারেরই সম্প্রসারিত রূপ হ'ল গ্রাম এবং তার সর্বোচ্চ রূপ হয় রাষ্ট্র—সেহেতু রাষ্ট্রও ব্যক্তিজীবনে স্বাভাবিক সংগঠন। পরিবারের ন্যায় রাষ্ট্রেরও লক্ষ্য হ'ল সর্বোচ্চ মঙ্গলসাধন। কারণ রাষ্ট্র হ'ল এক সুসংহত সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ। আরিস্টটলের এই দর্শন মধ্যযুগে অগাস্টিন-এর রচনায় এবং আধুনিক যুগে হেগেনের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, ঊনবিংশ শতকের অধিকাংশ দার্শনিকদের মধ্যে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। গ্যালিলিওর গতিতত্ত্ব ডারউইনের বিবর্তনবাদ, স্পেনসার, বেজহট প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকদের সমাজবিকাশের মূলসূত্রগুলিকে আবিষ্কার করার প্রয়াস, ইতিহাসের দর্শন গড়ে তোলার তাগিদ, অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতিবিকাশের

স্বরূপসন্ধান—সবই এই বিবর্তনবাদী ধারার অনুসারী। এককোষী প্রাণী থেকে বহুকোষী প্রাণীর যাত্রাপথের সঙ্গে সরল সমাজ থেকে জটিল শিল্পীয় সমাজের ক্রমরূপান্তরের বিষয়টির বিশ্লেষণ এই সমাজকার তাত্ত্বিকদের রচনার মূল বৈশিষ্ট্য।

আরিস্টটলের মত হেগেলও রাষ্ট্রকে বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেন। পরমমঙ্গল যেখানে আরিস্টটলের লক্ষ্য, হেগেনের রাষ্ট্রদর্শনে সেখানে যুক্তি/ভাব/আত্মার বিকাশই প্রধান। হেগেনের মতে এই লক্ষ্যপূরণের জন্যই তথা যুক্তি/ভাব/আত্মার বিকাশের প্রথম স্তর হিসেবে পরিবারের উদ্ভব। এই পরিবারেই যুক্তিসিদ্ধ পারস্পরিক প্রীতি বা ভালোবাসা মূর্ত হয়, মানুষের ইন্দ্রিয়জ অভাব বা প্রয়োজন মেটে। কিন্তু দেখা গেল বহুবিচিত্র মানবিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য পরিবার যথেষ্ট বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তখন উদ্ভব হয় পুরসমাজ (civil society)-এর, যা পরিবার (Thesis)-এর প্রতিবাদ (Anti-thesis), কারণ পরিবার যেখানে পারস্পরিক সর্বপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরসমাজ সেখানে মানুষের প্রয়োজনগুলি মেটানো সত্ত্বেও প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তিমঙ্গল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বিচ্ছিন্ন। পরিবার এবং পুরসমাজের সুবিধাগুলি নিয়ে এবং সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করে উভয়ের চেয়ে উন্নততর/উচ্চতর এবং পূর্ণতর যে প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভব ঘটল তা হ'ল রাষ্ট্র। এভাবে পরিবার ও পুরসমাজের অপূর্ণতা দূর করে উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও সমগ্রতাসাধন করে যুক্তি/ভাব/আত্মা তার চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা লাভ করে রাষ্ট্রের মধ্যে। এ কারণে, আরিস্টটলের মত হেগেলও মনে করেন, রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের এক স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকারও থাকতে পারে না। ব্যক্তি তার সার্থকতা খুঁজে পায় রাষ্ট্রের মধ্যে।

হেগেলের মত কার্ল মার্কসও রাজনীতিবিশ্লেষণে এই বিবর্তন ধারায় বিশ্বাসী। অবশ্য হেগেল যেখানে রাষ্ট্রকে যুক্তি/ভাব/আত্মার বিকাশের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, কার্ল মার্কস সেখানে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেন। যে সমস্ত মানুষ নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত তাদের জীবনের বাস্তবতা তথা বস্তুগতজীবন, উৎপাদনপ্রক্রিয়া। ও তার সঙ্গে মানানসই সামাজিক নিয়মকানুন ও সংগঠনের প্রকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জানা সম্ভব। মার্কসের মতে, সমাজবিকাশের তথা উৎপাদনপদ্ধতির বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্বে রাষ্ট্রের উদ্ভব। উৎপাদনপদ্ধতি যতদিন ছিল আদিম, যেখানে শ্রমবিভাজন ছিল না, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাও ছিল না এবং সে কারণে শ্রেণীও ছিল না—রাষ্ট্রের প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি। কিন্তু উৎপাদনপদ্ধতির বিকাশের ফলশ্রুতিতে আদিমসাম্যবাদী সমাজ ভেঙ্গে যাবার পর সমাজে শ্রমবিভাজন দেখা দেয়। গড়ে ওঠে সম্পত্তি-সম্পর্ক ও তারই পরিণতিতে বিভিন্ন শ্রেণী, তখনই শ্রেণীনিপীড়নের সহায়ক যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব। এই নবোদ্ভূত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর শোষণে সহায়তা করা এবং শৃঙ্খলারক্ষা করাই রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। তাই রাষ্ট্র বাইরে থেকে সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া কোন শক্তি নয়—সমাজবিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ের ফল। এভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে কার্ল মার্কস রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের রূপকে বিশ্লেষণ করেন। হেগেলের বক্তব্য থেকে কার্ল মার্কসের বক্তব্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হেগেল যেখানে রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিজীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা খুঁজে পেয়েছেন কার্ল মার্কস সেখানে রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের ধারণাকে খারিজ করে রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কথা বলেছেন। যেদিন সমাজে শ্রেণীশোষণের অবসান হবে, সেদিন রাষ্ট্রনামক শোষণযন্ত্রের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে। যে প্রয়োজনে অর্থাৎ

শ্রেণীশোষণের স্বার্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব সেই প্রয়োজনের অভাব রাষ্ট্রেরও অবলুপ্তি ঘটবে। গড়ে উঠবে রাষ্ট্রহীন এক সাম্যবাদী সমাজ।

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে রাষ্ট্রদার্শনিকদের উপরোক্ত বিবর্তনবাদের পাশাপাশি আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই ধারাটি পুষ্ট করেন সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ। বাজার এবং ধর্মের সম্প্রসারণের তাগিদে ইউরোপের বণিক ও যাজকশ্রেণী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি দেয়। ভিন্ন জনগোষ্ঠী (যা মূলতঃ আদিম ও প্রাক্-শিল্পীয়) সম্পর্কে ইউরোপীয়দের তাগিদ ও বিশ্লেষণ ইউরোপে এক নূতন ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটায়। তারই পরিণতিতে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের উদ্ভব। নৃতাত্ত্বিকগণ এই আদিম ও প্রাক্শিল্পীয় সমাজের রাজনৈতিক প্রকৃতিবিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পার্থক্যকে তুলে ধরেন এবং এই সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রতিটি সমাজই ব্যক্তি-গোষ্ঠী সম্পর্ক পরিচালনায় এক ধরনের শাসনব্যবস্থাকে কায়েম করে এই ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নাও হতে পারে। আদিম তথা প্রাক্শিল্পীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা সে সম্পর্কে ফোর্টস (Fortes), প্রিচার্ড (E. E. Evans Pritchard), স্যাপেরা (Schapera), র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Radcliffe Brown) প্রমুখ নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে সে সম্পর্কে সকলে একমত পোষণ করেন।

নৃতাত্ত্বিক মর্গান ব্যক্তির রাজনৈতিক বিকাশকে দু'টি স্তরে ভাগ করেন। প্রথম স্তরটি হ'ল জ্ঞাতিগোষ্ঠী সংগঠন, যাকে পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সংগঠন বলে অভিহিত করেন। মর্গানের মতে সম্পত্তির ধারণা এবং ভৌগোলিক এলাকাবিশিষ্ট সরকারের ধারণা পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট। এই পর্বটিকে রাষ্ট্র নামে অভিহিত করা না গেলেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা যায়। ফোর্টস (Fortes) এবং প্রিচার্ড (E. E. Evans Pritchard) আদর্শ সমাজের এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য করেন এবং মনে করেন প্রতিটি সমাজেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য সরকারের উপস্থিতি রাষ্ট্রের মধ্যেই এবং কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্ব, ভৌগোলিক প্রসারণ এবং বিচারবিভাগীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ একমাত্র রাষ্ট্রেরই বৈশিষ্ট্য যা সমাজবিকাশের ধারায় পরবর্তীকালে সৃষ্ট।

২.৩.২ বিভিন্ন উপাদান

রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশে যে সমস্ত শক্তি/উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাহ'ল—(ক) রক্তের সম্পর্ক, (খ) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, (গ) ক্ষমতা, (ঘ) ধর্ম এবং (ঙ) রাজনৈতিক চেতনা।

(ক) রক্তের সম্পর্ক—মর্গান, হেনরী মেইন (Henry Maine) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ জ্ঞাতিসম্পর্ককেই রাষ্ট্রগঠনের আদি উপাদান বলে উল্লেখ করেন। রক্তের সম্পর্কই ব্যক্তিকে গোষ্ঠীবদ্ধ করে একত্রে বসবাস করার প্রেরণা যোগায়। উত্তর আমেরিকার Iroquis উপজাতিদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে মর্গান এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ক্রমবর্ধিত জ্ঞাতিসম্পর্কই রাজনৈতিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিকগণও মনে করেন king শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে kin শব্দ থেকে। মর্গানকে অনুসরণ করে সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকাইভার বলেন, 'জ্ঞাতিসম্পর্কই সমাজ সৃষ্টি করেছে এবং সমাজ অবশেষে সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র'। অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিকই মনে করেন, যৌন চাহিদা ও রক্তের সম্পর্কই পরিবার গঠন ও সম্প্রসারণের অন্যতম কারণ। সম্প্রসারিত পরিবার ক্রমশঃ গোষ্ঠীর রূপলাভ করলে পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা মহিলার ন্যায় গোষ্ঠীর বয়ঃজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা মহিলার প্রাধান্য গোষ্ঠীর

অন্যান্য সদস্যদের কাছে স্বীকৃত হ'তে থাকে। পূর্বপুরুষের নাম, বংশচেতনা, গোত্রের ধারণা একদিকে যেমন বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ঐক্যবোধকে জাগ্রত করে অপরদিকে গোষ্ঠীচেতনা ও আনুগত্যের ধারণাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

স্যাপেরা (Schapera)-র মতে এমন কোন সমাজ নেই যেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সভ্য হওয়া একমাত্র জ্ঞাতিসম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। স্যাপেরার মতে, মর্গান যে উপজাতির উপর সমীক্ষা চালান সেই উপজাতিগুলি মূলতঃ শিকারী ও সংগ্রাহকগোষ্ঠী এবং এ কারণেই প্রকৃতিগতভাবে ভ্রাম্যমান। এই ভ্রাম্যমান প্রতিটি গোষ্ঠী রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ এবং প্রত্যেকে অপরগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন ও অপরগোষ্ঠীর যে কোনরকম নিয়ন্ত্রণমুক্ত। স্যাপেরা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বুশম্যান (Bushman)-দের উপর সমীক্ষা করেন। এই গোষ্ঠীগুলি পশুপালকগোষ্ঠী এবং প্রাথমিক স্তরের কৃষিভিত্তিকগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীগুলির সকল সদস্যই একই পরিবারভুক্ত বা বংশোদ্ভূত নয়। যৌন সম্পর্ক যখন ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটতে থাকে তখন একই পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হ'তে থাকে, ফলে বিভিন্ন গোত্র বা বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের নিয়ে এই গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠতে থাকে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক, বিভিন্ন গোত্রের বা বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে থাকে। এভাবে সম্প্রসারিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

(খ) অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ঃ অর্থনৈতিক কার্যাবলী আদিম যুগে ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিকারী ও সংগ্রাহক সমাজব্যবস্থায় যৌথ বসবাস ছিল অপরিহার্য, কারণ প্রকৃতি ও অন্যান্য জন্তুদের সঙ্গে সংঘর্ষে মানুষ বাধ্য হয়েছে যুথবদ্ধ হ'তে। জমির যেহেতু স্থানান্তরকরণ সম্ভবপর নয়, সেহেতু কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা মানুষকে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসে তথা গ্রামপত্তনে সহায়তা করেছে। জঙ্গল বা অকৃষিজমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরকরণ, সেচব্যবস্থা, কৃষিক্ষেত্রকে অন্যান্য পশু থেকে রক্ষা করা, কৃষিকার্য সম্পাদনে হাতিয়ার তৈরী করা—প্রভৃতির প্রয়োজনে মানুষের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তুলতে, একত্র বাস করতে বাধ্য করেছে। গ্রামের পত্তন, উদ্বৃত্ত খাদ্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব, শ্রমবিভাজন, শ্রমবিভাজনজনিত পরস্পরনির্ভরশীলতা ও বৈরিতা, শ্রেণীর উদ্ভব—সবকিছুই মানুষের সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সম্পত্তির ধারণা, বংশজদের মধ্যে সম্পত্তির প্রবাহমানতা তথা হস্তান্তরকরণ ক্রমশঃ আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে।

(গ) ধর্ম—আদিম সমাজব্যবস্থায় সমাজবন্ধনের ক্ষেত্রে ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আদিম সমাজে অবশ্য ধর্ম বলতে প্রকৃতি (প্রাকৃতিক শক্তি, যথা—জল, বাতাস, ঝড়, বজ্র, প্রাকৃতিক উপাদান যথা—গাছ, পাথর জন্তু) এবং পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপকে বোঝানো হ'ত। আদিম মানুষ ঝড়, বজ্র, ঋতুপরিবর্তন, ভূমিকম্প, দাবদাহ প্রভৃতি বিপর্যয়কে অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রোধ বলে মনে করত এবং এর থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিছু অর্পণ তথা পুজো করতো। অপরদিকে রোগ, শোক, দুঃখ-দুর্দশাকে পূর্বপুরুষের অসন্তুষ্টি বলে মনে করে সন্তুষ্টিবিধানে চেষ্টা করতো। স্বপ্নের ঘটনাকেও অতিন্দ্রিয় ঘটনা বলে মনে করা হ'ত। পূজাপার্বণ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীপতিই ছিলেন প্রধান এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণেই এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পাদিত হ'ত। এই গোষ্ঠীপতি ছিলেন একাধারে গোষ্ঠীর প্রধান পরিচালক, অপরদিকে পুরোহিত। পরবর্তীকালে শ্রমবিভাজনের ফলে এই দুই ধরনের কাজ দুই ভিন্ন পদাধিকারীর জন্ম দেয়। জেমস ফ্রেজার (James Frazer)-এর মতে উপজাতিদের মধ্যে প্রথম যে সরকারের নমুনা পাওয়া যায় তা বয়স্ক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সংস্থা

(Gerentocracy) এবং মনে করা হ'ত এই বয়স্ক ব্যক্তিগণ প্রকৃতি ও অতিপ্রাকৃত শক্তির রহস্যগুলি জানে এবং নিয়ন্ত্রণেও সক্ষম। ধর্মের প্রতি এই আনুগত্য সমাজের প্রতি আনুগত্যকেই বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং বলা যায়, ধর্ম আদিম সমাজে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে যৌথভাবে কার্যসম্পাদনে তথা গোষ্ঠীচেতনায় জাগ্রত করে ; আনুগত্যের শিক্ষা দেয় এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

(ঘ) ক্ষমতা—আদিম যুগের মানুষকে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে, অপরদিকে অন্যান্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার তাগিদে লড়াই করতে হয়েছে। খাদ্যসংগ্রাহক ও শিকারীসমাজে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে পশুর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে যুথবদ্ধভাবেই। পরবর্তীকালে পশুপালন ও খাদ্য-উৎপাদনের যুগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক। গৃহপালিত পশু যথা গবাদিপশুর অপহরণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের বিবরণ প্রাচীন যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋকবেদে স্তুতি করা হয়েছে 'গোধন'-এর জন্য, সংঘর্ষে পরাজিত ব্যক্তিগোষ্ঠীকে দাস হিসেবে ব্যবহার করার রীতিও লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে সম্পত্তি সংরক্ষণের তাগিদে, মালিকানা নিয়ে সংঘাত মীমাংসায় ক্ষমতাপ্রয়োগ ছিল আবশ্যিক। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতারই সংঘবদ্ধ রূপ। গোষ্ঠীসংঘর্ষে যে গোষ্ঠী জয়ী হ'ত সেই গোষ্ঠীর প্রধান রাজনৈতিক প্রধান বা শাসক হিসেবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হ'ত। যখন শাসক কর্তৃক রাজত্ব আদায়ের (প্রধানত, কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থার স্তরে) বিষয়টি চালু হ'ল তখন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার ধারণার সৃষ্টি হ'ল। এভাবে গড়ে উঠল নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাভুক্ত আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে (নিজগোষ্ঠী ও বিজিত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে) শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অন্যগোষ্ঠীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে এই ক্ষমতার সংরক্ষণ ছিল অপরিহার্য। এই ক্ষমতার ব্যবহারের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে সরকারী ব্যবস্থাপনা।

(ঙ) রাজনৈতিক চেতনা—রাষ্ট্রের বিকাশে রাজনৈতিক চেতনার বিষয়টি রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। সমস্বার্থগোষ্ঠীর মধ্যে সমজাতীয়তার ধারণা গড়ে ওঠে। সদস্যদের এই চেতনাই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হ'তে ও সংগঠন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে। অ্যারিস্টটলের রচনায় দেখা যায় সুখী জীবনের চেতনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। হেগেল মনে করেন ব্যক্তিচেতনার চরম প্রকাশ হিসেবে রাষ্ট্রের উদ্ভব। এমনকি, চুক্তিবাদী তাত্ত্বিক টমাস হবস এবং জন লক-এর রচনাতেও প্রকৃতি-রাজ্যে বসবাসকারী মানুষ প্রকৃতি-রাজ্য ছেড়ে রাষ্ট্র গঠন করেছে রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে। এই চেতনাই মানুষকে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করে ; রাষ্ট্রকে মেনে চলা বা না চলার তথা আনুগত্যের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে।

২.৩.৩. উপসংহার

বিবর্তনবাদী তত্ত্বে রাষ্ট্রকে সমাজবিকাশের এক পর্বে সৃষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ঠিক কোন্ পর্বে এবং কি ধরনের ঘটনাবলীর প্রভাবে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হ'ল সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। যদি ধরে নেওয়া যায়, প্রতিটি সমাজেই এমনকি আদিম সমাজেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং তা আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রপদবাচ্য নয়, তথাপি উক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের পার্থক্য নির্ণয় দুরূহ হয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাসম্পন্ন কর্তৃত্বের ধারণাই যদি রাষ্ট্রের জন্ম দেয় তাহলে সেই রাষ্ট্রের উদ্ভব চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের আগে নয়। এ কারণেই প্রাচীন গ্রীসের Polis-কে রাষ্ট্র বা নগর-রাষ্ট্র বলার পরিবর্তে পুর বা নগর বলাই বাঞ্ছনীয়। রোমানপর্বে civitas কেও রাষ্ট্র বলা যাবে কিনা তাও বিতর্কের বিষয়। তাছাড়া অ্যারিস্টটল

বা হেগেল-এর বিশ্লেষণে রাষ্ট্রসৃষ্টির পিছনে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সিঞ্চিতকরণ করা হয়েছে সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ ধরনের কোন উদ্দেশ্যকে চিহ্নিতকরণ করা হয়নি। এ কারণে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বিষয়টিও এই ধরনের বিশ্লেষণে অনুপস্থিত। অবশ্য রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে যে সমস্ত তত্ত্বগুলি রয়েছে তার মধ্যে বিবর্তনবাদী তত্ত্বটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কোন একটি উপাদান বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের উদ্ভবকে বিশ্লেষণ না করে রাষ্ট্রসৃষ্টির পিছনে বহুবিধ কারণের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অবশ্য, এর ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়। কার্ল উইটফোগেল (Karl Wittfogel, 1975)-এর ন্যায় বেশ কিছু তাত্ত্বিক রয়েছেন যাঁরা রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হিসেবে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থাকে দায়ী করেন। মেসোআমেরিকা (Mesoamerica), দক্ষিণ ইরাক (সুমেরীয় অঞ্চল) নীলনদের অববাহিকা অঞ্চলে যে প্রাচীনতম নগর-রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে তার অন্যতম কারণ হ'ল, উক্ত তাত্ত্বিকের মতে, কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা বা কৃষি-উৎপাদনব্যবস্থা। কৃষিউৎপাদনে সেচব্যবস্থায় শ্রমসরবরাহ ও পরিচালনার জন্য এক রাজনৈতিক এলিটগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং এই এলিটগোষ্ঠীই সমাজে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রবার্ট অ্যাডামস (Adams, 1960) অবশ্য দক্ষিণ ইরাকে (সুমেরীয় অঞ্চলে) নগররাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ হিসেবে সেচব্যবস্থার পরিবর্তে কৃষি-উৎপাদনব্যবস্থায় জমির মালিকানা, সীমানানির্ধারণ, উৎপাদন, অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে জমির এলাকা নিয়ে বিরোধনিষ্পত্তির জন্য নিরাপত্তাবাহিনী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন—প্রভৃতি কারণগুলিকে উল্লেখ করেন। রবার্ট অ্যাডামস-এর মতে, দক্ষিণ ইরাকে নগরপত্তনের গোড়ার দিকে সেচব্যবস্থা ছিল খুবই সাধারণ মানের এবং ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট যেখানে ব্যাপক শ্রম ও তা পরিচালনার প্রয়োজন হ'ত না। রবার্ট কারনায়েরো (Robert Carneiro, 1970)-র মতে ভৌগোলিক ও সামাজিক দিক থেকে আবদ্ধ এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ। পেরু অঞ্চলের উপর সমীক্ষা চালিয়ে কারনায়েরো এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে এবং পরাজিত গোষ্ঠীগুলিকে বিজয়ী গোষ্ঠীর অধীনে থাকতে হয়। অবশ্য, যতদিন পর্যন্ত স্থানাভাব না ঘটে ততদিন পর্যন্ত গোষ্ঠীগুলি বশ্যতার পরিবর্তে আরো গভীর অরণ্যে বা ফাঁকা জায়গায় বসতি গড়ে। কিন্তু, যখন পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি—প্রভৃতির ফলে আর নূতন বসতিস্থাপন সম্ভবপর নয় তখন আনুগত্য স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন পথ থাকে না। ব্লানটন (Richard E. Blanton) কোয়ানেস্কি (Kowaniski) ফিনম্যান (Fienman) অবশ্য রাষ্ট্রসৃষ্টির কারণ হিসেবে উপরোক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার করেন। কার্ল পোলানী (Karl Polanyi, 1957)-র মতে, প্রাচীনতম রাষ্ট্রগুলির উদ্ভবের কারণ হ'ল বাণিজ্য। রাইট এবং জনসন (Wright and Johnson) এই তত্ত্বের সমর্থনে বলেন, উৎপাদিত দ্রব্যগুলির রপ্তানি, আমদানিকৃত দ্রব্যগুলির বিষয়, বাণিজ্যের নিরাপত্তা—প্রভৃতি কারণে এক সংঘটিত ক্ষমতার দরকার হয়। এই সংগঠিত ক্ষমতাই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত আলোচনা থকে বলা যায়, ঠিক কোন্ কারণে এবং কেন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। সম্ভবত, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিস্থিতি কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার জন্ম দিয়েছে এবং যা পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে। সেচব্যবস্থা, কৃষিউৎপাদন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাণিজ্য প্রভৃতি ঘটনাগুলির মধ্যে কোন একটি ঘটনা বা একাধিক ঘটনার সমন্বয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভবে সহায়তা করেছে। কিন্তু সব জায়গাতেই একটিমাত্র ঘটনা উপাদানকেই রাষ্ট্রসৃষ্টির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা সমীচীন নয়।

২.৪ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

অতিপ্রাচীনকাল থেকেই রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, ব্যক্তিজীবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রকে মেনে চলার যৌক্তিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রকে ব্যক্তি-জীবনের এক স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান বলে ব্যাখ্যা করেন এবং একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তির মঙ্গল সাধিত হ'তে পারে বলে মতপ্রকাশ করেন। অ্যারিস্টটলের মত হেগেলও রাষ্ট্রকে ব্যক্তিসত্তার চরম প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে কার্ল মার্কস রাষ্ট্রকে শ্রেণীস্বার্থের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা এক নিপীড়নমূলক যন্ত্র-বলে অভিহিত করেন। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বগুলি হ'ল চুক্তিবাদী তত্ত্ব। জৈবতত্ত্ব, আদর্শবাদী বা ভাববাদী তত্ত্ব, উদারনীতিবাদী তত্ত্ব ও মার্কসীয় তত্ত্ব। এই সমস্ত তত্ত্বগুলির মধ্যে জৈববাদী তত্ত্ব এবং আদর্শবাদী তত্ত্বের আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। তত্ত্বদু'টির উদ্ভবের প্রেক্ষাপট, মূল বক্তব্য এবং সীমাবদ্ধতার বিষয়টিও আলোচিত হবে।

২.৪.১ জৈব মতবাদ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈব মতবাদে রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। চুক্তিবাদী তাত্ত্বিকদের ন্যায় জৈববাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে এক কৃত্রিম যন্ত্রবিশেষ বা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র না দেখে এক সজীব অখণ্ড সত্ত্বা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন এবং জীবদেহের অনুরূপ বলে মতপ্রকাশ করেন। রাষ্ট্রকে এভাবে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিশ্লেষণ করা হয় প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনায়। রোমক দার্শনিক সিসেরো ও মধ্যযুগের শেষপর্বের চিন্তাবিদ মার্সিলিওর রচনায় লক্ষ্য করা গেলেও এই মতবাদটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ঊনবিংশ শতকের দার্শনিকদের, বিশেষত ইংলন্ডের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের রচনায়।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের সমাজবিশ্লেষণে বিবর্তনবাদীধারা লক্ষ্য করা যায়। সরল সমাজ থেকে ক্রমোন্নয়নের মধ্য দিয়ে জটিল যৌগিক সমাজের রূপান্তরের যে চিত্র অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith 1723-1790), স্টিয়ার্ট (Dugald, Stewart 1753-1828), অ্যাডাম ফার্গুসন (Adam Ferguson 1723-1816) চিত্রায়িত করেন তারই পরিণতি দেখা যায় হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer 1820-1903)-এর রচনায়। এ সময় জীববিজ্ঞানীদের এবং সমাজতাত্ত্বিকদের রচনা রাজনীতিবিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। হার্বার্ট স্পেনসার প্রাণিজগতের বিবর্তনের সঙ্গে সমাজবিবর্তনের তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, প্রাণিজগৎ যেমন সরল থেকে ক্রমশ জটিল অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছে সমাজসভ্যতার বিবর্তন ও সেরূপ ক্রমশ সরল সমাজব্যবস্থা থেকে জটিল শিল্পীয় সমাজব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। পরস্পরনির্ভরশীল ও সংবদ্ধ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে যেমন জীবদেহ গঠিত রাষ্ট্র তথা সমাজ ও বিভিন্ন ব্যক্তি/শ্রেণী নিয়ে গঠিত। একইভাবে ব্লুন্টস্‌লি (Bluntsli) মানবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে বলেন, মানবদেহের যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট সমন্বিত একাজ প্রবাহ রয়েছে ; রাষ্ট্রেরও অনুরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তথা সহকারী ব্যবস্থা ও জীবনপ্রবাহ রয়েছে।

২.৪.২ জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা

জৈব মতবাদের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রকে কৃত্রিম নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হিসেবে না দেখে এক অখণ্ড সজীব সত্ত্বা হিসেবে,

জীবদেহের প্রতিরূপ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। জীবদেহের যেমন জন্ম, বিকাশ ও ক্ষয় রয়েছে রাষ্ট্রেরও সেরূপ সৃষ্টি, বিকাশ ও ক্ষয় ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই এই বিকাশের কারণ নিহিত থাকে দেহের অভ্যন্তরে।

দ্বিতীয়ত, জীবদেহে যেমন প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং কার্যসূত্রে আবদ্ধ ; কোন অঙ্গকে দেহ থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর নয়—রাষ্ট্রেরও সেরূপ ব্যক্তি ও ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। শরীর থেকে কোন কোষ বিচ্ছিন্ন হ'লেও যেমন সমগ্র শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, রাষ্ট্র থেকে কোন ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হ'লেও সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না।

তৃতীয়ত, জীবদেহের নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং তাহল তার বিকাশসাধন ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য দিয়ে জীবনপ্রবাহ বজায় রাখা। রাষ্ট্রের সেরূপ নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে।

চতুর্থত, জীবদেহের বিভিন্ন কোষ যেমন একটি স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় রাষ্ট্রও সেরূপ সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। জীবদেহের বিভিন্ন শিরা-উপশিরা যেমন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রাষ্ট্রও অনুরূপভাবে আঞ্চলিক ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

পঞ্চমত, জীবদেহের কোন অংশ বা কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে নতুন কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের স্থান পূরণ করে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মৃত্যুজনিত বা স্থানান্তরজনিত অনুপস্থিতি নূতন জমি দ্বারা পূরিত হয়। অনুরূপভাবে, একটি সরকারের স্থান অপর সরকার পূরণ করে, নূতন প্রজন্ম পূর্বপ্রজন্মের স্থান দখল করে, একটি যুগের পর আরেকটি যুগ আসে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

২.৪.৩ মূল বক্তব্য

জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের উপরোক্ত সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে জৈবতত্ত্বের প্রবক্তাগণ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসেন।

প্রথমত, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক বৈরিমূলক নয়—ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর-আবদ্ধ। রাষ্ট্রবিচ্ছিন্নভাবে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের লক্ষ্যের সঙ্গে ব্যক্তির লক্ষ্যের কোথাও ভিন্নতা নেই। এ কারণে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার ব্যক্তির নেই।

তৃতীয়ত, অংশের তুলনায় যেমন সমগ্র প্রধান, ব্যক্তির তুলনায় রাষ্ট্রই প্রধান ও চূড়ান্ত। রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাষ্ট্র নিজেই ; রাষ্ট্র অন্য কোনও উদ্দেশ্য পূরণের যন্ত্র বা মাধ্যম নয়।

চতুর্থত, ব্যক্তির যাবতীয় স্বাধীনতার উৎস রাষ্ট্র। রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের সঙ্গে স্বাধীনতার কোনও বিরোধ নেই। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের মধ্য দিয়েই তার স্বাধীনতা ভোগ করে, ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়।

২.৪.৪ সমালোচনা

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করে সমরূপতা প্রতিপন্ন করা সমীচীন নয়।

বস্তুত, জৈব তত্ত্বের অন্যতম সমর্থক হার্বার্ট স্পেনসার এই ধরনের সাদৃশ্য কল্পনার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট, সতর্ক ছিলেন। এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি নিম্নরূপ :

প্রথমত, জীবদেহে বিভিন্ন কোষগুলি এবং অঙ্গাপ্রত্যঙ্গাগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বা অসংলগ্ন নয়। কিন্তু সমাজ তথা রাষ্ট্রের অধিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নয়। এমনকি রাষ্ট্রে বসবাসকারী এমন অনেকেই রয়েছেন, যেমন বিদেশী, যাঁরা রাষ্ট্রের সদস্যও নন।

দ্বিতীয়ত, জীবদেহের কোনও একটি ক্ষুদ্র ও নির্দিষ্ট অংশে সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত থাকে কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যেমন পরিবর্তন ঘটতে পারে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুরও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

তৃতীয়ত, জীবদেহে কোনও কোষ বা অংশের কোনও স্বতন্ত্র্য অস্তিত্ব থাকে না কিন্তু কোনও ব্যক্তি এক রাষ্ট্র থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে অন্য রাষ্ট্রে সদস্যপদ নিতে পারে।

চতুর্থত, জীবদেহ এবং রাষ্ট্র উভয়েই পরিবর্তনশীল হলেও জীবদেহের পরিবর্তন অনেকাংশে প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে কিন্তু রাষ্ট্রের পরিবর্তন নির্ভর করে ব্যক্তির কার্যকলাপের উপর। কোনও কোনও রাষ্ট্রে দ্রুত সরকারের পরিবর্তন ঘটে। অন্যত্র সরকারের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

পঞ্চমত, জীববিজ্ঞানীগণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধীন ও রাষ্ট্রের ইচ্ছা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত বলে ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্রকে এক অখণ্ড, ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্ত্বা বলে প্রচার করে চরমতন্ত্রকেই সমর্থন করে থাকে।

ষষ্ঠত, জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

২.৪.৫ মূল্যায়ন

জৈব মতবাদের উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদে রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি/ব্যক্তি সংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাষ্ট্র যেমন ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়, ব্যক্তিও সেরূপ রাষ্ট্রনিরপেক্ষ নয়। উভয়ের সহযোগিতার উপরও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই তত্ত্ব কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে দার্শনিকদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ডুর্কেহ্যাইম (Durkheim)-এর কার্য কাঠামোতত্ত্বে, কার্ল মার্কস এর ভিত্তি-উপরি সৌধের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্বের মধ্যে জৈবতত্ত্বের ছাপ পাওয়া যায়। তাছাড়া জৈব তত্ত্ব একদিকে ব্যক্তির উপর এবং অপরদিকে সমাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এর ফলে, এই তত্ত্ব একদিকে হার্বার্ট স্পেনসারের ন্যায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীদের অপরদিকে হেগেলের মত সামগ্রিকতাবাদীদের দর্শনের উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

২.৫ ভাববাদ

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির মধ্যে ভাববাদ বহুলপ্রচলিত তত্ত্ব। প্রাচীন গ্রীসে এই তত্ত্বটি যেমন গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছিল আধুনিককালের রাষ্ট্র দার্শনিকগণ যথা কান্ট, হেগেল, টি. এইচ. গ্রীণ এই তত্ত্বটি সম্পর্কে সমান আগ্রহী। রাষ্ট্রকে কোনও ভাব বা আদর্শের প্রতিরূপ এবং চরম পরিণতি হিসেবে দেখার প্রবণতা প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মধ্যে দেখা যায়। প্লেটো রাষ্ট্রকে ন্যায়ের প্রতিরূপ হিসেবে দেখেছেন এবং আদর্শ রাষ্ট্রের রূপাঙ্কনে ন্যায়তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। অ্যারিষ্টটলের রচনায় যদিও পর্যবেক্ষণ

ও তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটেছে তথাপি সামগ্রিক বিচারে অ্যারিস্টটলও রাষ্ট্রকে ব্যক্তির সুন্দর জীবনের চরম প্রকাশ হিসেবে দেখেছেন।

ভাববাদী তত্ত্বটি বিশেষ পরিণতি লাভ করে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Emanannel Kant 1724-1804) এবং হেগেল (G.W.F. Hegel 1770-1831)-এর রচনায়। কান্ট ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের পর্যবেক্ষণমূলক বস্তুবাদী দর্শনের প্রতিবাদ হিসেবে আদর্শবাদকে তুলে ধরেন। কান্টের মতে দৃশ্যময় বস্তুজগতই তার প্রকৃত স্বরূপ নয়। বাহ্যত এবং আপাতদৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত সত্ত্বা ভিন্ন। অর্থাৎ জন লক যেখানে কাজের উৎস হিসেবে পর্যবেক্ষণকেই চিহ্নিত করেছেন কান্ট সেখানে মনন জগতের মধ্যেই প্রকৃত সত্তা বা জ্ঞানের অনুসন্ধান করেছেন। সেই বিচারে, বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ নয় ; আদর্শগত রূপই তার প্রকৃত স্বরূপ। কান্টের ন্যায় হেগেল-এর কাছেও রাষ্ট্র এক সাধারণ রাজনৈতিক সংগঠন নয়। রাষ্ট্র হ'ল এক নৈতিক সমগ্র বা চূড়ান্ত ও সার্বিক বিষয় যা ব্যক্তিস্বার্থ (পরিবার) ও সাধারণ স্বার্থ (civil society)-র মধ্যে সমন্বয় ঘটায়, সমগ্রের সঙ্গে ব্যক্তির সংযোগ ঘটায় এবং ব্যক্তির চরম আত্মিক উন্নতি সূচিত হয়। এককথায় যুক্তিময় ভাবসত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রের মধ্যে। এই যুক্তিময় ভাবসত্ত্বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তির যুক্তিময় ভাবসত্ত্বারই পূর্ণ প্রতিফলন। এ কারণে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী নয় ; বরং বলা চলে ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম সহায়ক। হেগেল-এর এই রাষ্ট্রদর্শনের চূড়ান্ত পরিণতি লক্ষ্য করা যায় নীৎসে (Nietzsche), বার্নহার্ডি (Bernherdi) এবং ট্রিটশে (Treitschke)-র হাতে যাঁরা চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন।

ইংলণ্ডে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে আদর্শবাদকে তুলে ধরেন টি. এইচ. গ্রীণ (T. H. Green), ব্রাডলে (F. H. Bradley) এবং বসানকুয়েট (Basanquet) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ। চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন যুক্তিময় ভাবসত্ত্বার আধারস্বরূপ হেগেলীয় রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে তৎকালীন ইংলণ্ডের উপযোগিতাবাদী তথা বেন্থামীয় ভাবধারার মিশ্রণ দেখা যায় টি. এইচ. গ্রীণের রচনায়। গ্রীণের তত্ত্বে প্রতিটি ব্যক্তি আত্মসচেতন ও আত্মসন্ধানী। ব্যক্তির এই আত্মসচেতনতা এক অনন্ত আত্মচেতনার আংশিক অভিব্যক্তি। এ কারণে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সামগ্রিক সত্তার তথা রাষ্ট্রসত্তার কোনও বিরোধ নেই। ব্যক্তির সর্বোচ্চ নৈতিক মঙ্গল প্রকৃতপক্ষে গণমঙ্গল তথা সমাজের সকলের মঙ্গালের সঙ্গে অভিন্ন। রাষ্ট্র যেহেতু এই গণমঙ্গালের যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করে সেহেতু রাষ্ট্রের তথা গণমঙ্গালের সঙ্গে ব্যক্তিমঙ্গালের কোন বিরোধ নেই। অবশ্য, তিনি হেগেলের মত রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যকে চরম ও শর্তহীন বলে মেনে নেননি। গ্রীণের কাছে ব্যক্তির দু'ধরনের বাধ্যতা রয়েছে। এক, নৈতিক বাধ্যতা (moral obligation) এবং দুই, আইনানুগ বাধ্যতা (legal obligation)। রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির যে বাধ্যতা তা আইনানুগ বাধ্যতা কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তি নিজে অন্তর্নিহিত যুক্তি ও বিবেকের কাছে বাধ্য। নৈতিক বাধ্যতা বস্তুত গ্রীণকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণে অনুপ্রাণিত করে। অবশ্য, রাষ্ট্রবিরোধিতার পূর্বে ব্যক্তিকে দু'টি ব্যাপারে সুনিশ্চিত হ'তে হবে। এক, রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিকে দেখতে হবে যে, এই বিরোধিতার ফল হবে এক নিশ্চিত সামাজিক মঙ্গাল তথা গণমঙ্গাল। সেই ব্যক্তিকে মহানাগরিকদের সঙ্গে এই গণমঙ্গাল সম্পর্কে একমত হ'তে হবে। দুই, দেখা দরকার এই বিরোধিতার ফলে যে নূতনতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তা পূর্বতন অবস্থার তুলনায় কাম্য কিনা।

২.৫.১ মূল বক্তব্য

ভাববাদের মূল বক্তব্যগুলি এভাবে সূত্রায়িত করা যেতে পারে।

প্রথমত, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থান একরৈখিক। অর্থাৎ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও বৈরিতা নেই। ব্যক্তি তথা সমাজবিকাশের চরম পরিণতি ঘটে রাষ্ট্রের মধ্যে। চুক্তির মাধ্যমে বা হঠাৎ করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়নি। ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি তার সম্পূর্ণতা পায় রাষ্ট্রের মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বাইরে যা সমাজবিচ্ছিন্নভাবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্র যেহেতু সমাজেরই বিকশিত রূপ সেহেতু রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট ; রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি তার জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পায়।

তৃতীয়ত, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে উদ্দেশ্যগত কোনও পার্থক্য নেই। এ কারণে ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্রের মধ্যেই নিহিত।

চতুর্থত, রাষ্ট্র যেহেতু এক অখণ্ড চরম সত্তা সেহেতু রাষ্ট্র কোনও লক্ষ্যসাধনের উপায় বা মাধ্যম নয়—রাষ্ট্র নিজেই নিজের লক্ষ্য।

পঞ্চমত, রাষ্ট্র কোনও স্বাভাবিক বা নৈতিক আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় ; রাষ্ট্র নৈতিকতার স্রষ্টা।

২.৫.২ সমালোচনা

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদী তত্ত্বটি বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক অসার তত্ত্ব হিসেবে সমালোচিত হয়েছে। বার্কার (Barker) মন্তব্য করেন, এই মতবাদ যে রাষ্ট্রের কল্পনা করে তা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ল্যাস্কি (Laski), জোড (Joad) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ ভাববাদী তত্ত্বকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র্য ব্যক্তির কোনও মূল্য নেই। একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেই ব্যক্তি তার অধিকারগুলি ভোগ করে। জোড এ ব্যাপারে মন্তব্য করেন, 'ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন—ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নয়'।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রকে এক অখণ্ড চরম সত্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে তত্ত্বটি এক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের প্রকৃতিকে তুলে ধরে। ম্যাকাইভারের মতে, এটি স্বৈরতন্ত্রের বৈধকরণের এক নূতন পন্থা। মানুষের তুলনায় মানবতাকে, রাষ্ট্রের সদস্যের তুলনায় জাতীয় জনসমাজকে (nationality) বড় মনে করা হয়। একদিকে যেমন এই তত্ত্ব রাষ্ট্রের স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দেয় অপরদিকে যুদ্ধবাজকে সমর্থন করে। এই তত্ত্বের মাধ্যমেই হেগেল প্রুশিয়ার স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছেন।

চতুর্থত, মার্কসীয় তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রকে যুক্তির চরম প্রকাশ হিসেবে না দেখে শ্রেণীশোষণ ও শাসনের প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। হেগেলের দ্বান্দ্বিক দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েও কার্ল মার্কস হেগেলের ভাববাদকে বর্জন করেন।

২.৫.৩ ভাববাদের সাম্প্রতিক রূপ

ভাববাদ মূলতঃ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিশ্লেষণে, ব্যক্তি-রাষ্ট্র সম্পর্ক বিশ্লেষণের তত্ত্ব। বিংশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজ দার্শনিকগণ, যথা—গ্রীণ, হবহাউস, বসানকোয়েট প্রমুখ উদারনৈতিক তাত্ত্বিকগণ নুতনভাবে যে ব্যাখ্যা দেন তাও মূলতঃ সার্বভৌম রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ভাববাদী তত্ত্ব ক্রমশঃ আন্তর্জাতিকতাবাদের চাপে নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। ব্যক্তি-সম্পর্ককে শুধুমাত্র জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বজনীনভাবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংহতির প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ শুরু হয়। উদারনৈতিক তাত্ত্বিকগণ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিশ্লেষণে নিজেদের আবদ্ধ রাখলেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা বিশ্ববাজার, বিশ্বশান্তি প্রভৃতির উপর ক্রমশঃ গুরুত্ব আরোপ করেন। অপরদিকে, আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, রাজনীতিবিশ্লেষণকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পর্যায়ে উন্নীতকরণ, মূল্যনিরপেক্ষ বিশ্লেষণের প্রবণতাও বাড়তে থাকে। জাতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণে আদর্শবাদী ভাবধারা ক্রমশঃ হ্রাস পেলেও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে আদর্শবাদ স্থান করে নেয়।

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, সমরায়োজন একদিকে যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাতের সুযোগ ঘটায় অপরদিকে আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনের এক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলিরও উদ্ভব ঘটতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই গড়ে ওঠে জাতিসংঘ (League of Nations)। বিশ্বযুদ্ধকে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পুরানো রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতায় সন্ত্রস্ত রাষ্ট্রগুলি গড়ে তোলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations)। বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে আন্তর্জাতিকতার প্রেক্ষাপটে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতিবিশ্লেষণে আদর্শবাদ নূতনভাবে আলোচিত হ'তে থাকে। ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে নৈতিকতার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন। রাশিয়ায় ১৯৮০-র দশকে মিখাইল গর্বাচভ কমিউনিস্টদুনিয়ার পরিবর্তে বিশ্বসহযোগিতা ও যৌথ নিরাপত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বপরিবার গঠনের কথা বলেন। অস্ট্রেলিয়ার কূটনীতিবিদ জন বার্টন (John Burton) এই বিশ্বসমাজের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতির নবমূল্যায়ন করেন। তিনি এমন এক রাষ্ট্রের কথা বলেন যেখানে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে—(১) বিশ্বশান্তি স্থাপন ; (২) বিশ্বসহযোগিতা ; (৩) মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ; (৪) বিশ্বপরিবেশ সংরক্ষণ ; (৫) যৌথ নিরাপত্তা ; (৬) সন্ত্রাসবাদ দমনে প্রতিটি দেশের সহযোগিতা এবং (৭) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই নয়া ভাববাদে জাতীয় রাজনীতির বিশ্লেষণে মূল্যবোধের বিষয়টি কাম্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একদিকে বৃহৎ শক্তিগুলির অনৈতিক কার্যকলাপকে সমালোচনা ও অপরদিকে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২.৫.৪ মূল্যায়ন

ভাববাদকে বাস্তববিবর্জিত এক অসারতত্ত্ব হিসেবে সমালোচনা করা হলেও তত্ত্বটি তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটেই সৃষ্ট। দীর্ঘকালব্যাপী পেলোপনেসীয় যুদ্ধে গ্রীস যখন বিধ্বস্ত, এথেন্স-এর গৌরব যুদ্ধোন্মত্ত স্পার্টার কাছে ম্লান তখন একজন এথেন্সবাদী হিসেবে কিভাবে এথেন্সের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়, সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন করা যায় তারই প্রেক্ষিতে প্লেটো আদর্শরাষ্ট্রের রূপাঙ্কন করেন ন্যায়তত্ত্বের যুক্তিজাল বিস্তারের মাধ্যমে।

একইভাবে বলা যায়, কান্ট এবং হেগেলের তত্ত্ব তৎকালীন জার্মানীর বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত। কিভাবে জার্মানীকে এক শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় তাই ছিল জার্মান দার্শনিকদের লক্ষ্য। তাছাড়া প্লেটো, অ্যারিস্টটল, রুশো, কান্ট, হেগেল প্রমুখ ভাববাদী তাত্ত্বিকগণ ব্যক্তির সুন্দর জীবনকে প্রধান বলে মনে করেন। রাষ্ট্র এই সুন্দর জীবনেরই চরম প্রতিফলন। ব্যক্তিস্বার্থ যে গোষ্ঠীস্বার্থের পরিপন্থী নয়—ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক—এই বক্তব্য সমাজের শৃঙ্খলা তথা সংহতিকেই তুলে ধরে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে রাজনীতিচর্চাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার নামে যে মূল্য নিরপেক্ষ রাজনীতিচর্চা শুরু হয়েছিল তা এই শতকেরই শেষের দিকে ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হতে থাকে। রাজনীতিচর্চায় ভাববাদের নবমূল্যায়ন শুরু হয়।

২.৬ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে চুক্তিবাদী তত্ত্বটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে বিবর্তনবাদী তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

(৩) রাষ্ট্রের উদ্ভবে ধর্ম ক্ষমতার ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

(৪) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈববাদীদের মূল বক্তব্যগুলি কী কী? এই মতবাদের যৌক্তিকতা বিচার করুন।

(৫) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ভাববাদী তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করুন। এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) চুক্তিমতবাদের সাম্প্রতিক রূপটি উল্লেখ করুন।

(২) ভাববাদী তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করুন।

(৩) রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে টমাস হবস-এর বক্তব্য উল্লেখ করুন।

(৪) নয়া ভাববাদের বক্তব্যটি উল্লেখ করুন।

(৫) রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে জৈববাদের দু'টি সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করুন।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(১) C.B. Macpherson : The Political Theory of Possessive Individualism Hobbes to Locke. Oxford (1962)

(২) O.P. Gauba : An Introduction to Political Theory. Macmillan India Ltd., New Delhi. (1981/1995)

(৩) Roy, Amal and Bhattacharya, Mohit : Political Theory, World Press (1968).

(৪) Sabine, G.H. : A History of Political Theory, Holt Pinchart and Winston Inc. (1964) বঙ্গানুবাদ—হিমাংশু ঘোষ—রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস। বাঁকুড়া ইনস্টিটিউট, বাঁকুড়া। (১৯৮৮)।

(৫) সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ : রাষ্ট্রবিজ্ঞান। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলকাতা। (১৯৯৭)।

একক—৩ ❐ রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

- ৩.২.১ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
- ৩.২.২ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য
- ৩.২.৩ ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাম্প্রতিক রূপ
- ৩.২.৪ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা
- ৩.২.৫ মূল্যায়ন

৩.৩ সমাজতন্ত্রবাদ

- ৩.৩.১ সমাজতন্ত্র ধারণাটির ক্রমবিকাশ
- ৩.৩.২ সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা
- ৩.৩.৩ সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য
- ৩.৩.৪ সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ
  - (ক) মার্কসীয় সমাজতন্ত্র
  - (খ) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র
  - (গ) বাজারধর্মী সমাজতন্ত্রী
  - (ঘ) সামাজিক/গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র
- ৩.৩.৫ মূল্যায়ন

৩.৪ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্ব

- ৩.৪.১ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
- ৩.৪.২ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ
- ৩.৪.৩ জনকল্যাণকর ধারণার বিকাশ
- ৩.৪.৪ জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সমালোচনা

(ক) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র—পরিবর্তিত অর্থনীতি
(খ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র—নয়া দক্ষিণপন্থীদের সমালোচনা
(গ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও জনপছন্দ তত্ত্ব
(ঘ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র—মার্কসবাদী সমালোচনা
(ঙ) নারীবাদীদের বিশ্লেষণে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র
(চ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও বর্ণবিদ্বেষবিরোধী সমালোচনা
(ছ) জনকল্যাণকর রাষ্ট্র ও সবুজ আন্দোলন
৩.৪.৫ মূল্যায়ন
৩.৫ অনুশীলনী
৩.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রের কার্যে পরিধি সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন কয়েকটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করাই এই এককের (একক 'গ') উদ্দেশ্য। আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে রাষ্ট্রের প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা, যদি বা থাকে তাহলে রাষ্ট্র কী ধরনের কাজ করবে ইত্যাদি বিষয়গুলি আমরা এখানে আলোচনা করব। আমাদের আলোচনার মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রতত্ত্ব।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্পর্কে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বক্তব্যটি বিংশ শতকের সত্তরের দশকে নতুন করে ফিরে এসেছে। আমাদের আলোচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই দুই ধারাই আলোচিত হবে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এত বেশী মত রয়েছে যে, সেগুলিকে একটি তত্ত্বের মধ্যে রাখা যায় কিনা সে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই সমাজতন্ত্রের কয়েকটি মূল বক্তব্য এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ইউরোপে এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র কাকে বলে, এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের কারণ, মূল বক্তব্য ইত্যাদি যেমন আলোচিত হবে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার যে ঝড় উঠেছে তাও বিবেচিত হবে। এই অধ্যায়টি পঠন-পাঠনের পরে আমরা জানতে পারব :

- রাষ্ট্রের কার্যাবলীর সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সাবেকি বক্তব্য।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আধুনিক রূপ।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সীমাবদ্ধতা।
- সমাজতন্ত্র কাকে বলে?
- সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ যেমন মার্কসীয় সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র বাজারধর্মী সমাজতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।

- জনকল্যাণকর রাষ্ট্র কাকে বলে?
- জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ।
- জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন।
- জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা।

৩.১ প্রস্তাবনা

ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের কাজের পরিধি প্রভৃতি বিষয়ে রাজনীতিবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle, 384-322 BC) রাষ্ট্রকে ব্যক্তিজীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেন। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব ; রাষ্ট্রবিহীন মানুষ হয় অতিমানুষ নতুবা অমানুষ—হয় দেবতা নতুবা পশু—এই ছিল অ্যারিস্টটলের মত। টমাস হবস (Thomas Hobbes, 1588-1679) রাষ্ট্রকে ব্যক্তির সমাজজীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেন। অপরদিকে টমাস পেইন (Thomas Paine, 1737-1809) বেন্থাম (Bentham, 1748-1832) প্রমুখ দার্শনিকগণ মনে করেন, রাষ্ট্র যত কম কাজ করে ততই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল। কারণ, রাষ্ট্রের কাজের সীমানার সম্প্রসারণ মানেই ব্যক্তিস্বাধীনতার সংকোচন। রাষ্ট্র একটি অশুভ কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। একমাত্র নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকগণ ছাড়া সকলেই রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে কম-বেশী স্বীকার করেছেন। এমনকি মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ বিশেষত ভি. আই. লেনিন (V. I. Lenin, 1870-1924) যিনি রাষ্ট্রকে গুঁড়িয়ে দেবার ডাক দেন, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণে সর্বহারার একনায়কত্বে রাষ্ট্রের সাময়িক উপস্থিতিকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কিত তত্ত্বগুলিকে মূলত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব
(২) সমাজতন্ত্রবাদী তত্ত্ব
(৩) জনকল্যাণকারী রাষ্ট্রতন্ত্র

৩.২ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ শব্দটির মধ্যেই তত্ত্বটির মূল বক্তব্য পরিস্ফুট। এখানে ব্যক্তিই প্রধান। ব্যক্তির প্রয়োজনেই সমাজ ও রাষ্ট্র। সুতরাং ব্যক্তির চলার পথে সমাজ/রাষ্ট্র কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না। রাষ্ট্র যত কম কাজ করে ততই ব্যক্তির পক্ষে মঙ্গল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর কাছে ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা ও উদ্যোগই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দু'টি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্যায়ে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ইংলণ্ডে জন লক, টক পেইন, বেন্থাম, জেমস মিল এবং আংশিকভাবে জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill, 1806-1874)-এর রচনায় এবং ফ্রান্সের ফিজিওক্রাট নামে পরিচিত অর্থনীতিবিদগোষ্ঠী, ইংলণ্ডে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith, 1723-1790) প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের রচনায় বিধৃত। দ্বিতীয় পর্যায়টি সাম্প্রতিককালে বা বিংশ শতকের সত্তর-এর দশকে রবার্ট নজিক (Robert Nozick, 1938-), রথবার্ট (Rothbert), ওলসন (Olson, 1982) প্রমুখের রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

৩.২.১ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভবের পটভূমি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভাঙ্গন, পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভব, ধর্মীয় প্রাধান্যের পরিবর্তে চুক্তির প্রাধান্য ব্যক্তি-প্রাধান্যের যুগের সূচনা করে। রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মার্টিন লুথার (Martin Luther, 1483-1546) ও শিল্পসাহিত্যে মিচেল এ্যাঞ্জেলো (Michel Angelo, 1475-1564), লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da-Vinchi, 1452-1519) প্রমুখ নবজাগরণের পথিকৃৎগণ ব্যক্তির পুনর্জাগরণে সাহায্য করেন। লুথার বা ক্যালভিন (Calvin, 1509-1564)-এর মতে প্রতিটি ব্যক্তিই যেহেতু যুক্তির অধিকারী সেহেতু প্রতিটি ব্যক্তি ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজ মত দ্বারাই পরিচালিত হবে। ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli, 1469-1527) ব্যক্তির যে চরিত্রচিত্রণ করেন তা একান্তভাবেই স্বার্থবোধযুক্ত আত্মকেন্দ্রিক। টমাস হবস-এর মানুষ নবজাগ্রত, বিকাশোন্মুখ পুঁজিপতিশ্রেণীরই প্রতিচ্ছবি। চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করলেও হবস-এর চুক্তিতত্ত্ব ব্যক্তির অধিগ্রাহী (Possessive-যাকে ম্যাকফারসান Possessive individualism বলে অভিহিত করেন) চরিত্রকে তুলে ধরে। জন লক (John Locke, 1632-1704)-এর তত্ত্বে ব্যক্তির অধিগ্রাহী ভূমিকা আরো স্পষ্ট। লকের মতে রাষ্ট্রের উদ্ভব শুধুমাত্র ব্যক্তির সম্পত্তি, স্বাধীনতা ও জীবনরক্ষার জন্য। বস্তুত, জন লকের তত্ত্বে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারাটি প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপিত হয়।

জীববিজ্ঞানী ডারউইন (Charles Darwin, 1809-1882)-এর যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন (Survival of the fittest) তত্ত্বে প্রভাবিত হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer, 1820-1903) মন্তব্য করেন, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপকে সীমাবদ্ধ করা শুধু প্রয়োজনীয়ই নয় জীববিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে যুক্তিসংগতও। এই কারণে, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনরকম সাহায্য, অনুদান প্রভৃতি ব্যবস্থারও তিনি ঘোর বিরোধী। 'Man versus State' গ্রন্থটির নামকরণই স্পেনসারের মনোভাবকে তুলে ধরে। বেন্থাম, জেমস মিল প্রমুখ উপযোগিতাবাদী তাত্ত্বিকগণ ব্যক্তির সুখলিপ্সাকেই প্রধানতম লক্ষ্য বলে মনে করেন। রাষ্ট্রের কাজ হবে ব্যক্তির এই সুখলিপ্সাকে বাধা না দেওয়া। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর রচনায় ধ্রুপদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ছাপ যেমন স্পষ্ট অপরদিকে আধুনিক উদারনীতিবাদের যা জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কথা বলে, সুরও শোনা যায়। জন স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তির আচরণকে একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক (self-regarding) এবং যা অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত (other-regarding)-এই দুই ভাগে ভাগ করেন এবং মনে করেন প্রথম ক্ষেত্রে কোনওরকম নিয়ন্ত্রণই কাম্য নয়।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধ্রুপদী ধারাটি লক্ষ্য করা যায় অষ্টাদশ শতকের ফরাসী অর্থনীতিবিদ (যাদের নেতৃত্বে ছিলেন এফ. কোয়েসনে (F. Quesnay, 1694-1774) এবং যাঁরা ফিজিওক্রাট নামে পরিচিত) গোষ্ঠীর লেখায়। ফিজিওক্র্যাসি (Physiocracy) শব্দটির অর্থ—Rule of Nature। ফিজিওক্রাটদের বক্তব্য হ'ল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন হস্তক্ষেপ করবে না। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকেই রক্ষা করবে এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে। মুক্ত-বাণিজ্য তথা Laisser faire অর্থনীতিই প্রধান। Laisser faire ধারণাটি সম্ভবত উদ্ভূত হয়েছে ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই-এর আমলে। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর অর্থমন্ত্রী কোলবার্ট (Colbert) যখন 'কী ধরনের অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা উচিত' বলে প্রশ্ন তোলেন তখন এক বণিক উত্তর দেন—Laissez faire-Laisser passer. কৃষিক্ষেত্রেই সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের একমাত্র উৎস হওয়া

উচিত এবং শিল্পবাণিজ্যকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা উচিত। ইংলণ্ডে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith, 1723-1790), ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo, 1772-1823), রবার্ট ম্যালথাস (Robert Malthus, 1766-1834) প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ *Laissez faire* তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যক্তি-পুঁজির বিকাশকেই সমর্থন করেন। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের চাহিদা ও যোগানের কঠোর নিয়ম (Iron Law of Demand and Supply), মজুরীর কঠোর নিয়ম প্রভৃতি মাধ্যমে মুক্তবাজারী বা খোলাঅর্থনীতির তত্ত্বই প্রচারিত হয়েছে।

৩.২.২ ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। ধ্রুপদী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বে রাষ্ট্রের কার্যের সম্প্রসারণকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করা হয়। ব্যক্তি কতকগুলি অধিকার নিয়েই জন্মায়। রাষ্ট্র সেই অধিকারগুলির রক্ষকমাত্র ; স্রষ্টা নয়।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির অর্থনৈতিক বিকাশে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কাম্য নয়, কারণ তা ব্যক্তির উদ্যোগকেই ব্যাহত করে। তৃতীয়ত রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যত কম হবে ততই মঙ্গল। জন লক-এর মতানুযায়ী রাষ্ট্র শুধুমাত্র নৈশপ্রহরীর কাজ করবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তিনটি কাজের উল্লেখ করেন—(১) সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করা—কোনও ব্যক্তির অধিকার অপর ব্যক্তির অধিকারকে যেন খর্ব না করে তা দেখা ; (২) ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিগুলি প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং (৩) বাহ্যিক আক্রমণ থেকে নিরাপত্তাবিধান করা। রাষ্ট্রের পক্ষে পুলিশব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা ও সামরিক বাহিনী থাকাই যথেষ্ট। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং অন্যান্য দায়দায়িত্বগুলি ব্যক্তির এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

৩.২.৩ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাম্প্রতিক রূপ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সাম্প্রতিক ধারাটি লক্ষ্য করা যায় ১৯৭০-এর দশকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি ও আমেরিকায় নব্য দক্ষিণপন্থীদের (New Rights), বিশেষত নব্য উদারনীতিবাদীদের বক্তব্যে। এই নব্য দক্ষিণপন্থীদের মতে দু'টি ধারা রয়েছে একটি নব্য উদারনীতিবাদী ধারা, অপরটি নব্য, রক্ষণশীল ধারা—অর্থনীতির ক্ষেত্রে হায়েক (Friedrich Hayek, 1899-1992) ও ফ্রিডম্যান (Milton Friedman, 1912) এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ওলসন রথবার্ট (Rothbart) ও রবার্ট নজিক-এর রচনায়।

১৯৬০ ও ৭০-এর দশকে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তার অন্যতম কারণ হিসেবে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা ও জনকল্যাণ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক চাপকেই দায়ী করা হয়। 'যা কিছু সরকারী তাই খারাপ', উদ্যোগহীনতা, সঞ্চয়ের তুলনায় ব্যায়াধিক্য, দলীয় নিয়ন্ত্রণ, আমলাতান্ত্রিক কাঠামো, নির্বাচনী রাজনীতি, কর্মে অদক্ষতা ও ফাঁকি—সবই সরকারী ব্যবস্থার নমুনা। অপরদিকে বেসরকারী ব্যবস্থায় বাজারই প্রধান বিবেচিত হওয়ায় ব্যক্তিগত উদ্যোগ, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের গুণগত উৎকর্ষলাভ—সম্ভবপর হয়। এই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে প্রতিযোগিতা, দক্ষতা ও সৃজনশীলতা হ্রাসকারী 'মৃত হস্ত' (dead hand) বলে উল্লেখ করেন এবং মনে করেন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ দু'টি ক্ষেত্রেই সীমিত থাকা উচিত। (১) বিনিময়-মাধ্যমের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা যাতে মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে ; (২) মূল্য নির্ধারণ, একচেটিয়া অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ—ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরী করা। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের কাছে তাইওয়ান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর হ'ল আদর্শ

ব্যবস্থা। শুধুমাত্র তত্ত্বক্ষেত্রেই নয়, বাস্তবেও সত্তরের দশকে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে জনকল্যাণকর কর্মসূচি ছাঁটাই করে সরকারী ব্যয় হ্রাস করা হয়। ইউরোপের যে সমস্ত দেশগুলিতে মিশ্র অর্থনীতিব্যবস্থা চালু ছিল সেখানে সরকারী উদ্যোগের পরিবর্তে বেসরকারী উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ব্রিটেনে থ্যাচার ও মেজর সরকার, ফ্রান্সের চিরাক সরকার গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলিকে যথা—টেলিকমিউনিকেশন, জল, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বেসরকারীকরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গৃহীত না হ'লেও ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে শিল্পে যে সরকারী নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করা হয় তা এ সময় হ্রাস করা হয়। এ ব্যাপারে রেগন প্রশাসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজনীতির ক্ষেত্রে এই নব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারাটি তুলে ধরেন রবার্ট নজিক, রথবার্ট এবং ওলসন। এই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ গণতান্ত্রিক রাজনীতির চাপ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন এবং মনে করেন গণতন্ত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপস্থিতি, গোষ্ঠী-রাজনীতির নির্বাচনী চাপ যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেই পঙ্গু করতে পারে। গণতন্ত্রের এই চাপ চাহিদাভিত্তিক অথবা যোগানভিত্তিক হ'তে পারে। চাহিদাভিত্তিক চাপ সমাজের মধ্য থেকেই বিশেষত নির্বাচনী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় রাজনীতিবিদগণ একে অপরকে অতিক্রম করে নির্বাচকমণ্ডলীকে প্রমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিশ্রুতি, ব্যয়বহুল কর্মসূচীর কথা বলে। অথচ, এই প্রতিশ্রুতি পূরণে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের জন্য যে অতিরিক্ত করের বোঝা, মুদ্রাস্ফীতি, বিনিয়োগের অব্যবস্থা, অর্থনীতির উপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি করে, সে বিষয়টি আদৌ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয় না। সামুয়েল ব্রিটন (Samuel Britton, 1977) বিষয়টিকে গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ফলাফল বলে অভিহিত করেন। ব্রিটেনের মতে, গণতন্ত্রের এই লাগামহীন প্রকৃতির অর্থনৈতিক ফলাফল হ'ল মুদ্রাস্ফীতি, জাতীয় ঋণ, করের বোঝা এবং রাজনৈতিক ফলাফল হ'ল রাষ্ট্রীয় পরিধির সম্প্রসারণ যা ব্যক্তির অধিকার, উদ্যোগ ও বিকাশকে ব্যাহত করে।

যোগানভিত্তিক চাপ হ'ল রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন চাপ যা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং রাষ্ট্রকর্মচারীদের কাছে থেকে উদ্ভূত হয়। নব্য দক্ষিণপন্থীদের মতে বিংশ শতকে যে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য দেখা যায় তা অর্থনৈতিক বা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য গণচাপ (popular pressure) বা শ্রেণীসংঘাত উপশমে পুঁজিবাদকে স্থায়িত্বদানের জন্য চাপ মাত্র নয়—রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গতিরই ফলশ্রুতি। উইলিয়ম নিসকনেন (William Niskanen, 1971) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট তৈরীর বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখান যে, সরকারী বাজেট মূলত বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারাই তৈরী হয় এবং এই উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ জানেন কিভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চিন্তাভাবনাকে একটা কাঠামোয় দাঁড় করানো যায়। স্বাভাবিকভাবেই, সরকারী কর্মচারিগণ চাইবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি আসলে তাদেরই ক্ষমতাবৃদ্ধি, বেতনবৃদ্ধি, চাকুরির নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাবৃদ্ধি।

অর্থনীতির ক্ষেত্রের মতো রাজনীতির ক্ষেত্রেও কম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের তত্ত্ব প্রচার করেন রবার্ট নজিক, রথবার্ট প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ। রাষ্ট্রকে গুটিয়ে ফেলার (rolling back the state) তত্ত্ব ঊনবিংশ শতকের laissez faire তত্ত্বেরই প্রতিরূপ। Anarchy,ssss State and Utopia (1974) গ্রন্থে রবার্ট নজিক ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারকে জন লকের ন্যায় চূড়ান্তভাবে সংরক্ষণের পক্ষে মতপ্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে, রবার্ট নজিকের মতে, দু'টি বিষয় দেখা প্রয়োজন এবং তাহল সম্পত্তি প্রাথমিক পর্বে সঠিকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এক

ব্যক্তির কাছ থেকে অপর ব্যক্তির কাছে তা সঠিকভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে কিনা। বলাবাহুল্য জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তা জন রলস-এর তত্ত্বের জবাবেই নজিকের এই স্বল্পক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের ধারণার বিস্তার। জনকল্যাণকর কর্মসূচিগ্রহণ, সম্পদের পুনর্বণ্টন প্রভৃতির পরিবর্তে রাষ্ট্রের ন্যূনতম কার্যসম্পাদন, সর্বাপেক্ষা কম করবোঝা প্রভৃতি রবার্ট নজিক সুপারিশ করেন। রথবার্ট-এর মতে, রাষ্ট্র কর্তৃক শৃঙ্খলারক্ষা, নিরাপত্তাবিধান করা, চুক্তিগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব সম্পাদনেরও কোনও প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের এই কাজগুলিও বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর অর্পণ করা উচিত। নিরাপত্তাবিধান ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব যদি বেসরকারী সংস্থাগুলির উপর অর্পণ করা হয় তাহলে বেসরকারী সংস্থাগুলি পরস্পর মুনাফালাভের প্রতিযোগিতায় আরও বেশী কার্যকরী হবে এবং জনগণও সস্তায় দায়িত্বপূর্ণ ও দক্ষ সেবা পাবে। একইভাবে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় আদালতগুলির পরিবর্তে যদি বেসরকারী আদালত ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এই আদালতগুলি ন্যায়বিচারের সুনামের তাগিদে ভালোভাবে এবং দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদন করবে। এভাবে রাষ্ট্রের কাজকে যত ন্যূনতম স্তরে নিয়ে আসা যায় এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা যায় তার সপক্ষে এই সমস্ত তাত্ত্বিকগণ বক্তব্য রাখেন। শুধুমাত্র তত্ত্বগত ক্ষেত্রেই নয় ; ব্রিটেনে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু রাজ্যে ইতিমধ্যেই বেসরকারী নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এমনকি, বেসরকারী সালিশীব্যবস্থাও পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

সি. ই. এম. জোড (C. E. M. Joad) আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবক্তা হিসেবে এই শতকেরই গোড়ার দিকে গোষ্ঠীস্বাতন্ত্রবাদের প্রবক্তাদের বিশেষ করে নরম্যান এ্যাঞ্জেল (Norman Angell), গ্রাহাম ওয়ালাস (Graham Walls) এবং হিলারি বেলক (Hilaire Belloc)-এর নাম উল্লেখ করেন। কারণ এই তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, একমাত্র গোষ্ঠীভিত্তিক গণতন্ত্রে দলব্যবস্থা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারকে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করা যায়। কিন্তু গোষ্ঠীও যে রাষ্ট্রের ন্যায় একইভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করতে পারে সে সম্পর্কে জোড সচেতন ছিলেন না। জোড কথিত উপরোক্ত তাত্ত্বিকদের আদৌ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলা যায় কিনা সে সম্পর্কে তাই প্রশ্ন উঠতে পারে। নয়া দক্ষিণপন্থী তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রের ন্যায় গোষ্ঠীরাজনীতিকে ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেন। ওলসন তাঁর The Logic of Collective Action : Public goods and the theory of groups (1968) গ্রন্থে গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকারী ব্যায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন। ওলসন-এর মতে জনগণ স্বার্থগোষ্ঠীতে যোগদান করে সর্বজনীন দ্রব্য (Public goods) অর্জনের জন্য। সর্বজনীন দ্রব্য বলতে বুঝিয়েছেন সেই সমস্ত দ্রব্য যা বিনা প্রতিদানেই পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, বেতনবৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। কোনও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকসংগঠনের সদস্য না হয়েও, বেতনবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আহূত ধর্মঘটে যোগ না দিয়েও কোনও ব্যক্তির বেতনবৃদ্ধি ঘটতে পারে ধর্মঘটে যোগদানকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় কোনও ঝুঁকি না নিয়েই ব্যক্তির পক্ষে 'বিনা টিকিটের যাত্রী' (Free rider) হওয়ার সুযোগ থেকে যায়। গণতন্ত্রে এমনকি সামাজিক গোষ্ঠীগুলিতেও যেখানে সদস্যসংখ্যা বেশী সেখানে এই বিনা টিকিটে যাত্রীর সংখ্যাও বেশী। The Rise and Decline of Nations (1982) গ্রন্থে ওলসনের মতে, গোষ্ঠীরাজনীতি বিশেষ করে শ্রমিকসংগঠনগুলি, বাণিজ্যিক গোষ্ঠী এবং বৃত্তিগোষ্ঠীগুলির সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী একটা দেশের সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে আর্থিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। ১৯৮০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন এবং ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচারকে এই গোষ্ঠীরাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হয়।

৩.২.৪ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিশেষত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ধারণা সম্প্রসারণের পরবর্তী পর্বে একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ তত্ত্বের প্রসার ঘটে অপরদিকে এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনাও সোচ্চার হ'তে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের ধ্রুপদী ধারণা গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভবের কালে ব্যক্তিপুঁজির অনিয়ন্ত্রিত বিকাশের স্বার্থে। বলাবাহুল্য, পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এবং তৎসংশ্লিষ্ট উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর সংকট ডেকে আনে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীদের কথিত অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা যে সমাজে সংকট সৃষ্টি করে তা অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হ'তে থাকে। জন স্টুয়ার্ট মিল এ কারণেই বেন্থাম বা জেমস মিল-এর বক্তব্য থেকে সরে আসেন এবং যা আপরকে স্পর্শ করে, এরূপ স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। বাজারদখলের লড়াই-এর ফলশ্রুতিতে বিশ্বযুদ্ধগুলি, ১৯৩০-এর অর্থনৈতিক মন্দা এটাই প্রমাণ করে যে, অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক বিকাশ আসলে অর্থনৈতিক সংকটকেই ডেকে আনে।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণমুক্ত পুঁজির বিকাশ হলেও জার্মানী এবং জাপানে অর্থনীতির বিকাশে রাষ্ট্র অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। রাশিয়া এবং চিনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী পর্বে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল সন্দেহাতীত। সুতরাং, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাত্ত্বিকগণ রাষ্ট্রের যে নেতিবাচক ভূমিকার কথা বলেন তা একপেশে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথে অন্তরায় হিসেবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদীগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তাও সঠিক নয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কখনও কখনও অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তাছাড়া, অধিকাংশ লিখিত শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে এবং আদালতের উপরে দায়িত্ব অর্পিত হয় ঐ অধিকারগুলি সংরক্ষণের। রাষ্ট্র অধিকারের রক্ষক এবং অনেকাংশে স্রষ্টার ভূমিকাও পালন করে।

চতুর্থত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ রাষ্ট্রকে অশুভ বলে বর্ণনা করলেও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করেন এবং বিরোধ মীমাংসায়, সম্পাদিত চুক্তির সংরক্ষণে এবং বহিঃআক্রমণের মোকাবিলায় রাষ্ট্রের ভূমিকা স্বীকার করেন। বলাবাহুল্য, এ ধরনের কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে স্বল্পক্ষমতাশালী হিসেবে রাখা যায় না। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিক্ষার সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেন। বিভিন্ন দেশের দুর্ভিক্ষের উপর অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেন খাদ্যের ঘাটতি দুর্ভিক্ষের কারণ নয় ; মূল কারণ হ'ল মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে দুর্ভিক্ষের প্রবণতা কম কারণ গণতন্ত্রের নির্বাচনী চাপ শাসককে বাধ্য করে দুর্ভিক্ষের মোকাবিলায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী বলে তিনি মন্তব্য করেন।

৩.২.৫ মূল্যায়ন

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত যুক্তিগুলি উত্থাপিত হ'লেও একথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সম্প্রসারণ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে ওঠে। ব্যক্তির মধ্যে একদিকে যেমন নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয় অপরদিকে রাজনৈতিক কার্যে অংশগ্রহণে অনীহা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ গড়ে ওঠে। রাষ্ট্র এক বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হ'তে থাকে। অপরদিকে, রাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীলতা ব্যক্তিগত উদ্যোগকে যেমন খর্ব করে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেও প্রসারিত করে। ১৯৭০-এর পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্র নামক অতিদানব-এর নিয়ন্ত্রণ থেকে

ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা বর্তমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

৩.৩ সমাজতন্ত্রবাদ

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্বের বিপরীতধর্মী তত্ত্বটি হ'ল সমাজতন্ত্রবাদ, যেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে সমাজকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato, BC 428-347 BC) বা ষোড়শ শতকে টমাস মোর (Thomas, More, 1428-1535), সপ্তদশ শতকের লেভেলার্স (Levellers) বা ডিগার্সদের (Diggers) বক্তব্যে ফরাসী বিপ্লব পর্বে বাবফ (Babeuf)-এর বক্তব্যে সমাজতন্ত্রের বিষয়টি ব্যক্ত হ'লেও রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব ঊনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের তথা ব্যক্তিমুনাফাভিত্তিক শিল্পীয় উৎপাদনব্যবস্থার প্রতিবাদ হিসেবে। পুঁজিবাদের বিকাশের প্রথম দিকে পুঁজিপতিশ্রেণির দর্শন হিসেবে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব, পুঁজিবিকাশের পরবর্তী স্তরে শ্রমিকশ্রেণির দর্শন হিসেবে গড়ে ওঠে সমাজতন্ত্রের দর্শন।

৩.৩.১ 'সমাজতন্ত্র' ধারণাটির ক্রমবিকাশ

সমাজতন্ত্র শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রবার্ট ওয়েন (Robert Owen, 1771-1851) ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে Cooperation পত্রিকায় এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে Association of All Classes of All Nations প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়েন-এর মতই ফ্রান্সে সাঁ সিমো (Saint Simon, 1760-1825), শার্ল ফুরিয়ে (Charles Fourier, 1772-1837) পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের দর্শন গড়ে তোলেন। এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের রচনায় যথেষ্ট মানবিক আবেদন থাকলেও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রকৃত বিশ্লেষণে এবং সমাজপরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে শ্রমিকশ্রেণিকে চিহ্নিত করলে এই তত্ত্ব ব্যর্থ হয়। এ কারণে এই সমস্ত তাত্ত্বিকদের কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিক এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮)-তে সমালোচনামূলক ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী বলে অভিহিত করেন।

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যে দার্শনিকের নাম বিশেষভাবে যুক্ত তিনি হলেন কার্ল মার্কস (Karl Marx, 1818-1883) এবং সহযোগী বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (Friedrick Engels, 1820-1895)। কমিউনিস্ট লীগের কর্মসূচী হিসেবে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত Communist Manifesto পুস্তিকায় মার্কস-এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন হিসেবে সমাজতন্ত্রের দর্শন গড়ে তোলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত গোথা ঐক্য কংগ্রেস (Gotha Unity Congress-1875)-এ বিরুদ্ধ বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে রচিত The Critique of the Gotha Programme-এ কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ধ্বংস ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার উত্তরণে প্রথম স্তর বলে উল্লেখ করেন। গোথা কংগ্রেস-এ সমাজতন্ত্রের আরেকটি ছক উপস্থাপিত করেন মার্কস-এর বিপরীত শিবিরে অবস্থানকারী তাত্ত্বিক Lassalle যিনি আশা করেছিলেন সার্বজনীন ভোটাধিকার রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করবে কারণ প্রত্যেকের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ মুক্ত জনগণেরকে মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলবে। পুঁজিবাদী সমাজের ক্রমরূপান্তরের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার তথ্য হাজির

করেন আর এক তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড বার্ণস্টাইন (Edward Bernstein, 1850-1932)। বিপ্লবের পরিবর্তে ক্রমপরিবর্তনের / বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার এই তত্ত্বটি বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। ইউরোপের বেশ কিছু দেশে এবং সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার এই ধারাটি লক্ষ্য করা যায়।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের ক্ষমতাদখল এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় দর্শনের এক প্রায়োগিক দিক হিসেবে বিবেচিত হ'তে থাকে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চিনে একদিকে জাপান অপরদিকে চিনের জাতীয়তাবাদী কুয়োমিংতাং-এর বিরুদ্ধে বিপ্লব, পরবর্তীকালে ফ্রান্স এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের বিপ্লব, চে গুয়েভারার নেতৃত্বে কিউবায় এবং পরে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকামদতপুষ্ট বা বাতিস্তাশাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লব, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শেই পরিচালিত।

অপরদিকে লেনিন এবং তৎপরবর্তীকালে স্তালিন সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং তার পিছনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা কতদূর মার্কসবাদের অনুপন্থী সে নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে থাকে। রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সম্প্রসারণ, কমিউনিস্ট পার্টির সর্বাত্মক প্রাধান্য, আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে জাতীয় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, কর্মের মধ্যে ও সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আমলাতন্ত্রের প্রসার, কায়িক ও বৌদ্ধিক শ্রমের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান প্রভৃতি বিষয়গুলির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হ'তে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ভাঙ্গনকে 'সমাজতন্ত্রেরই মৃত্যু' বলে সমালোচকগণ ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে ১৯৮৯-৯২ পর্বে পূর্ব-ইউরোপের সোভিয়েত আদলে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে যায়। বিপ্লব উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে চিন টিকে থাকলেও বিভিন্ন সংস্কারসাধনের মাধ্যমে যে বাজারী অর্থব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে তাতে চিনকেও কতদূর মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের ভাবধারাপুষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশ বলা যাবে—সে নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়।

বিংশ শতকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দ্বারা শুধুমাত্র ইউরোপই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'তে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে নিজ দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে খাপ খাইয়ে নেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যেখানে পুঁজিবাদ অপরিণত, শ্রমিকশ্রেণি অসংগঠিত, এমনকি অর্থব্যবস্থাও মূলত কৃষিনির্ভর বা প্রাক্-শিল্পীয় সেই সমস্ত দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে মেশানোর প্রচেষ্ঠাও শুরু হয়। এর প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হ'ল ভারতে স্বাধীনতাসংগ্রামে মানবেন্দ্রনাথ রায়, নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ, যদিও সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, কে শত্রু, কে মিত্র বলে বিবেচিত হবে সেই বিষয়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে দ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। এভাবে সমাজতন্ত্র কোন সুনির্দিষ্ট তত্ত্বের আকারে হাজির না হয়ে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধাঁচের সমাজতন্ত্রের ধারণার সূচনা করে।

৩.৩.২ সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা

উদ্ভবগত দিক থেকে Socialism শব্দটি লাতিন 'Socius' থেকে এসেছে যার অর্থ হ'ল 'Companion'

(সহযোগী/সঙ্গী)। Socialism শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে Cooperation পত্রিকায়। এর পর থেকে এ পর্যন্ত এমন কোন রাজনীতিবিজ্ঞানী নেই যাঁর রচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অধিকাংশ তাত্ত্বিকই সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন। যে কয়েকজন তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সমাজতন্ত্রের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা গড়ে না ওঠার কারণ হল সমাজতন্ত্র মার্কসবাদ, সর্বহারার একনায়কত্ব, সকল জনগণের রাষ্ট্র, সাম্যবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, সামাজিক গণতন্ত্র প্রভৃতি শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহার অথচ প্রতিটি শব্দের এক সুনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা রয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হ'ল সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বক্তব্যের ভিন্নতা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক সংঘাতের সৃষ্টি করেছে। মার্কসবাদ বনাম নৈরাজ্যবাদ, কমিউনিস্ট বনাম সোসালিস্ট, যৌথবাদী বনাম সংঘবাদী, সংস্কারপন্থী বনাম বিপ্লবী, ট্রটস্কিপন্থী বনাম লেনিনপন্থী—সমাজতন্ত্রের শিবিরেই এই বিভাজন অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কারণে রেমণ্ড উইলিয়মস মন্তব্য করেন, প্রত্যেকের নিজেদের সমাজতন্ত্রী হিসেবে আখ্যায়িত করা নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রবণতাগুলির মধ্যেকার বিরোধ দীর্ঘদিনের এবং তা জটিল ও তিক্ত। এন্থনি রাইট (Anthony Wright) অনুরূপ মন্তব্য করেন, সমাজতন্ত্রের ইতিহাস হ'ল সমাজতন্ত্রসমূহের ইতিহাস। তাছাড়া, এই ইতিহাস ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধুত্বের নয় ; পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ও বৈরিতার।

সমাজতন্ত্রের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদানের আরেকটি হ'ল সমাজতন্ত্র শুধুমাত্র রাষ্ট্র সম্পর্কে এক তাত্ত্বিক মতবাদ নয় ; সমাজ-রাষ্ট্র পরিবর্তনেরও এক মতবাদ। ঊনবিংশ শতককে যদি সমাজতন্ত্রের তত্ত্বেরও শতক বলে চিহ্নিত করা যায় তাহলে বিংশ শতক হ'ল সমাজতন্ত্রের প্রয়োগের এবং সংকটের শতক। ভিন্নতর পরিস্থিতিতে ভিন্ন সমাজ কাঠামোয় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা ও তজ্জনিত তত্ত্বের সৃজন ঘটিয়েছে ; যার ফলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা তথা মত গড়ে ওঠেনি। এ কারণে এন্থনি রাইট Socialisms : Theories and Practices গ্রন্থে মন্তব্য করেন—সমাজতন্ত্র বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে সংজ্ঞার অভাব নেই কিন্তু যার অভাব রয়েছে তা হ'ল সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Communist Manifesto পুস্তিকায় মার্কস এবং এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র/সামন্ততান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, পেটি বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র, জার্মান প্রকৃত সমাজতন্ত্র, রক্ষণশীল বা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্র এবং সমালোচনামূলক কাল্পনিক সমাজতন্ত্র—প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রের উল্লেখ করলেও সমাজতন্ত্রের কোনও সংজ্ঞা দেননি। The Critique of the Gotha Programme (1875) গ্রন্থে কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের প্রথম সোপান হিসেবে উল্লেখ করেন। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত The State and Revolution গ্রন্থে লেনিন বলেন, 'আমরা যাকে সাধারণত সমাজতন্ত্র বলি কার্ল মার্কস তাকে কমিউনিস্ট সমাজের প্রথম বা নিম্নবর্তী স্তর হিসেবে উল্লেখ করেছেন'। The Critique of the Gotha Programme-এ কার্ল মার্কস সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রদানের পরিবর্তে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। যেমন—শ্রমের উপকরণকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিতকরণ, দ্রুত ব্যক্তিশ্রমের সঙ্গে গড় সামাজিক শ্রমের সমন্বয়সাধন এবং বাজারের কোনও এজেন্সি ছাড়া ব্যক্তিগত শ্রমের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতিদান, সামাজিক উৎপাদনের যৌথ ভোগ, জনগণের সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে কিছু ভারী মাল উৎপাদিত পণ্যকে বন্টন না করা, গুণগত এবং পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে

শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী বন্টনের ব্যবস্থা করা।

Andrew Haywood সমাজতন্ত্র শব্দটির অন্তত তিন ধরণের অর্থ নির্দেশ করেছেন। এক, সমাজতন্ত্র হ'ল এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদীব্যবস্থার বিপরীত, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ এবং পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেয়। দুই, সমাজতন্ত্র হ'ল শ্রমিক-আন্দোলনের এক হাতিয়ার ; তিন, সমাজতন্ত্র হ'ল কতকগুলি ধারণা, মূল্যবোধ এবং তত্ত্ব নিয়ে গড়ে ওঠা এক রাজনৈতিক মতাদর্শ। এই শেষোক্ত অর্থেই তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেন Politics (1997) গ্রন্থে।

৩.৩.৩ সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখেছি সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা নিয়ে রাজনীতিবিজ্ঞানীগণ একমত নন। তা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, সমাজতন্ত্র মানুষকে যেভাবে চিত্রিত করে তা সামাজিক মানুষ। এখানে ব্যক্তি-প্রতিযোগিতার পরিবর্তে ব্যক্তি-সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ওয়েন কথিত গোষ্ঠীভ্রাতৃত্ব থেকে শুরু করে মার্কস-এঙ্গেলস-এর 'সব দেশের শ্রমিক এক হও'-এর আহ্বান এই বিশ্বভ্রাতৃত্বেরই ইঙ্গিত।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক, প্রতিযোগী, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিরোধী এবং উৎপাদন-উপকরণের ও উৎপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। এই যৌথ মালিকানার প্রকৃতি নিয়ে অবশ্য সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে ; যেমন সামাজিক, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় অথবা বিকেন্দ্রীভূত শ্রমিক-সমবায়ভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে সমাজতন্ত্রীগণ একমত নন।

তৃতীয়ত, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে যেমন স্বাধীনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব করা হয়, সমাজতন্ত্রে সেখানে সমতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং মনে করা হয় সামাজিক নিরাপত্তা, সংহতি, উৎপাদনের প্রবাহমানতা প্রভৃতি বজায় রাখার জন্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং আইনগত ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সমতার প্রয়োজন। অবশ্য সমতার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি, সমতার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

চতুর্থত, সমাজতন্ত্রে শ্রেণীর উদ্ভব, বিকাশ ও সংঘাত সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং মনে করা হয় রাষ্ট্রে উদ্ভব শ্রেণিশোষণব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্য। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই শ্রেণিশোষণের অবসান ঘটতে পারে।

পঞ্চমত, সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ সমাজপরিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভব সম্পর্কে আশাবাদী। এই পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণীই মুখ্য ভূমিকা নেবে। অবশ্য এই পরিবর্তন কীভাবে হবে—ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে—সে সম্পর্কে তাত্ত্বিকগণ একমত নন।

ষষ্ঠত, সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় এবং ক্ষমতাসম্পন্ন এক রাষ্ট্রের প্রয়োজন। অবশ্য, এই চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের কার্যকালের মেয়াদ নিয়ে সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মার্কসবাদীগণ মনে করেন, সমাজতন্ত্র হ'ল পুঁজিবাদীব্যবস্থা থেকে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণে এক উৎক্রমণশীল পর্যায়। সুতরাং, পুঁজিবাদীব্যবস্থার অবশেষকে ধ্বংস করার দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণী তথা সর্বহারার একনায়কত্বে পরিচালিত রাষ্ট্রের।

ব্যক্তিগত পুঁজি-বিকাশের সহায়ক ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে উৎপাদন-উপকরণের সামাজিক মালিকানা যেদিন প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন রাষ্ট্র নামক শোষণযন্ত্রেরও অবসান ঘটবে। পরবর্তী মার্কসবাদী তাত্ত্বিকগণ যেমন, পুনালৎযাস (Poulantzas) এবং মিলিব্যাণ্ড (Ralph Miliband) রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতপোষণ করেন। সামাজিক গণতন্ত্রের, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের এবং বাজারধর্মী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগণ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে শুধু স্বীকারই করেন না—রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার সপক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

সপ্তমত, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রবক্তাগণ সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্র-বিরোধী ও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক এক ব্যবস্থা বলে মনে করেন। সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধমূলক অবস্থানের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রকেই প্রকৃত গণতন্ত্র বলে দাবী করেন। লেনিন বা আপতেকার (Aptheker) গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদী / বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র—এই দুই ভাগে ভাগ করেন এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোনও বিরোধ স্বীকার করেন না। Democratic Theory and Socialism (1989) গ্রন্থে ফ্রাঙ্ক কানিংহাম (Frank Cunningham) এই মতপোষণ করেন 'পুঁজিবাদ কাম্য নয় কারণ পুঁজিবাদ গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত হতে দেয় না। একমাত্র সমাজতন্ত্রই গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে সহায়ক।' কানিংহামের কাছে গণতন্ত্রই মূল লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য সমাজতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ উপায়।

৩.৩.৪ সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা ও 'সমাজতন্ত্র' ধারণাটির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনায় আমরা দেখেছি, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব গড়ে ওঠেনি। পরিবর্তে, যা রয়েছে তা হ'ল বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের এই বিভিন্ন ধরণগুলিকে আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

ঊনবিংশ শতকে রবার্ট ওয়েন, চার্ল ফুরিয়ে বা সাঁসিমো বর্ণিত মানবিকতাবাদী সমাজতন্ত্রকে এঙ্গেলস কল্পবাদী সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করেন। Lassalle বর্ণিত সংস্কারবাদী বা এডওয়ার্ড বার্ণস্টাইন বর্ণিত বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র ছাড়াও মূল ধারাটি ছিল কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর সমাজতান্ত্রিক ধারা যা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। এছাড়া, মূলত ফ্রান্সে প্রুঁধো প্রভাবিত সোরেল (Sorel) এবং বার্গসন (Bergson)-এর শ্রমিক সংঘবাদ (Syndicalism) হবসন (S. G. Hobson), ওরেজ (A. R. Orage), পেন্ট্রি (A. J. Pentry), কোল (G. D. H. Cole)-এর সংঘ সমাজবাদ (Guied socialism) ব্রিটেনে সিডনি ওয়েব ও বিয়াট্রিস ওয়েব, বার্ণাডশ, এইচ. জি. ওয়েলস-এর নিম্নবর্গীয় সমাজবাদ সমাজতন্ত্রের অন্যান্য কয়েকটি ধারা। সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী পর্বে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রকে কয়েকটিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—

(১) মার্কসীয় সমাজতন্ত্র।

(২) রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র।